আগুন-নদীতে সাঁতার

মোশাররফ হোসেন খান

আগুন-নদীতে সাঁতার

মোশাররফ হোসেন খান

সমাহার পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

আগুন-নদীতে সাঁতার ❑ মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশনায় ঃ সমাহার পাবলিকেশন্স, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। কম্পোজ ঃ অলিম্পিক কম্পিউটার, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (২য় তলা)। প্রচ্ছদ ঃ জহির উদ্দিন বাবর। অলঙ্করণঃ ইমু মুঠোফোন ঃ ০১৯১৮৪৭৭৩৬৫, ০১৬৭৩২২৩৪০২।

প্রথম প্রকাশ ঃ ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা- ২০০৯
© লেখক
মূল্যঃ ৪০.০০ (চল্লিশ টাকা) মাত্র। US$: 2.00

ISBN: 984-70005-0024-7

www.pathagar.com

সূচিপত্র

শুকনো হাড়ে অবাক চিহ্ন ৫
জীবনের আগে যে প্রাণ জাগে ১৫
আগুন-নদীতে সাঁতার ১৯
মহৎ মহান ২৬
পিপাসায় কাঁদে দরিয়া ৩৪
প্রতিপক্ষে আপনজন ৪০
সাহসের নিত্য সহচর ৪৭
ঝরা পাতার বাহিনী ৫৪
ভালোবাসায় ভেজা ভোর ৫৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শুকনো হাড়ে অবাক চিহ্ন

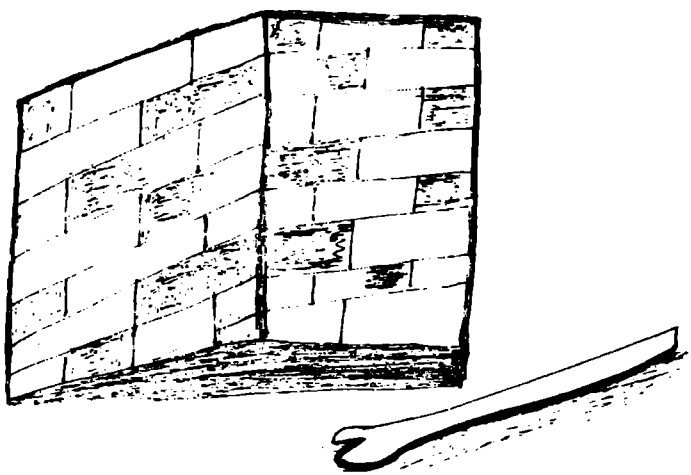

মুহাম্মাদ (সা) মক্কায় নেই!

খবরটি বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।–

তিনি মক্কায় নেই? তাহলে? তাহলে কোথায় গেলেন মুহাম্মাদ (সা)? কুরাইশদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

খুঁজতে শুরু করলো চারদিকে।

খুঁজতে থাকে, তল্লাশি চালাতে থাকে বনী হাশিমের প্রতিটি বাড়ি। ছুটে যায় মহানবীর (সা) ঘনিষ্ঠ জনদের বাড়িতেও। যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে তাঁকে। কুরাইশদের এটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

www.pathagar.com

দুষ্টরা খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে গেল আবু বকরের (রা) বাড়িতে। তাদের মুখোমুখি হলেন আবু বকরের (রা) মেয়ে আসমা। জিজ্ঞেস করলেন নির্ভয়ে, কি ব্যাপার!

কুরাইশ নেতা পাপিষ্ঠ আবু জেহেল। চোখে-মুখে তার হিংস্রতার ছাপ। রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আব্বা কোথায়?

আবু জেহেলের সামনে আসমা সংশয়হীন, স্থির। বললেন 'জানি না! তিনি এখন কোথায় তা আমি কেমন করে জানবো?'

আসমার জবাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো নরাধম আবু জেহেল। সাথে সাথে সে আসমার গালে বসিয়ে দিল একটি সজোরে থাপ্পড়। থাপ্পড়ের আঘাতে আসমার কানের দুলটি ছিটকে পড়লো দূরে। তিনিও লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

বেদনায় ভারী হয়ে উঠলো চারপাশ। কেঁদে উঠলো মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা।

আসমার গালে থাপ্পড়ের চিহ্ন! একি কোনো মানুষের কাজ!

থমকে দাঁড়ালো মক্কার বাতাস। আবু বকরের (রা) বাড়ি থেকে ফিরে এল আবু জেহেল।

তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে। ভাবলো, কোথাও যখন মুহাম্মাদকে (সা) পাওয়া যাচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই তিনি চলে গেছেন মক্কা থেকে।

সঙ্গোপনে। কিন্তু কোথায় যাবেন? কত দূরে? অস্থিরভাবে ভাবতে থাকলো আবু জেহেল।

মুহূর্ত মাত্র।

তারপর একদল পদচিহ্ন বিশারদকে লাগিয়ে দিল কাজে। তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হল রাসূলকে (সা) খুঁজে বের করার।

রাসূলের (সা) পদচিহ্ন ধরে তাঁকে ধরার জন্য তারা বেরিয়ে পড়লো।

মক্কা থেকে বেরিয়ে রাসূল (সা) আশ্রয় নিয়েছেন সাওর পর্বতের গুহায়।

www.pathagar.com

সাথে আছেন প্রিয়সাথী আবু বকর (রা)। সাওর পর্বতের গুহায় তাঁরা অবস্থান করছেন।

ঠিক এমন সময় আবু জেহেলের নিয়োগকৃত পদচিহ্ন বিশারদরা কুরাইশদের সাথে পৌঁছে গেল সেখানে।

তারা কুরাইশদেরকে বললো, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ এখানে, এই সাওর পর্বতের গুহাতেই আছে।'

'সত্যিই?' কুরাইশদের চোখে-মুখে দ্বিধা আর সংশয়। হৃদয়ে প্রতিহিংসার তুফান।

'কেন নয়? নিশ্চয়ই আছে। এখন কেবল তাদেরকে খুঁজে বের করার পালা।'

গুহার ভেতর জ্যোতির্ময় মহান পুরুষ রাসূল মুহাম্মাদ (সা)। সাথে তাঁর প্রিয়বন্ধু আবু বকর। গুহার ভেতর থেকেই তাঁরা শুনতে পাচ্ছেন শত্রুদের সকল কথা।

শুনতে পাচ্ছেন তাদের পদধ্বনি। এমনকি দেখতে পাচ্ছেন তাদের পায়ের পাতা।

মাথার ওপরেই শত্রুদের পা। আর গুহার ভেতর তাঁরা। শঙ্কিত আবু বকর (রা)। এই বুঝি শত্রুরা ধরে ফেললো তাঁদের! তারপর?–

ভাবতেই শিউরে উঠলেন তিনি। চোখ দু'টো টলমল দীর্ঘ। শ্রাবণ যেন বা নেমে এসেছে মুষলধারায় আবু বকরের (রা) চোখে বুকের ভেতর এ কিসের শব্দ?

তাঁর দিকে তাকালেন রাসূল (সা)! কী প্রশান্ত, কী শীতল এক দৃষ্টি! চড়ুইয়ের পালকের চেয়েও যেন হালকা রাসূলের (সা) হৃদয়। সেখানে কোনো দুশ্চিন্তা নেই দুর্ভাবনা নেই। নেই কোনো পরিণামের ভয়। প্রিয়সাথী আবু বকরকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'চোখে পানি কেন?'

আবু বকর কিছুটা কাঁপাস্বরে বললেন, 'রাসূল (সা)! হে প্রিয়তম রাসূল

www.pathagar.com

আমার! আমার পরিণামের কথা ভেবে আমি কাঁদছিনে। কাঁদছি কেবল আপনার কথা চিন্তা করে। আল্লাহ না করুন, ওরা যদি আপনার প্রতি কোনোপ্রকার দুর্ব্যবহার করে, আর তা যদি আমাকে দেখতে হয়, তাহলে এর চেয়ে বেদনার আর কিছুই থাকবে না। না, সে আমি সইতে পারবো না কিছুতেই!'

রাসূলের (সা) কণ্ঠ স্থির। স্থির এবং গভীর বিশ্বাসে সুদৃঢ়।

বললেন, 'দুশ্চিন্তা করো না আবু বকর! আল্লাহপাক আমাদের সাথে আছে।'

তাঁদের মাথার ওপর শত্রুরা। আবু বকর তখনো চিন্তামুক্ত হতে পারছেন না।

রাসূলকে (সা) বললেন, 'হে রাসূল! তারা যদি কেউ তাদের পায়ের পাতার দিকে তাকায় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদেরকে দেখে ফেলবে!'

আবারও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন রাসূল, 'আবু বকর! তুমি কি মনে কর আমরা মাত্র দু'জন? ভয় পেও না। আল্লাহ পাকও আমাদের সাথে আছেন।'

সাওর পর্বতের গুহার ভেতর রাসূল (সা) এবং হযরত আবু বকর। আর তাঁদের মাথার ওপর কুরাইশ দস্যুরা। তাদের সাথে আছে পদচিহ্ন বিশারদ।

কুরাইশদের একজন বললো, 'এস। তোমরা সবাই গুহার দিকে এগিয়ে এস। গুহার ভেতরটাও আমরা একটু ভাল করে দেখে নিই। হতে পারে, এখানেই লুকিয়ে আছেন মুহাম্মাদ (সা)।'

সত্যিই আল্লাহর কী মহিমা! লোকটির কথা শুনে উমাইয়্যা ইবন খালফ তাকে তিরস্কার করলো। উপহাসের সাথে বললো, 'গুহার ভেতর যাবে? দেখছো না, গুহার মুখে মাকড়সা ও তার বাসা! এগুলি খুবই পুরনো। গুহার ভেতর যদি কোনো লোক প্রবেশ করতো, তাহলে অবশ্যই এই মাকড়সা ও তার জাল এখানে থাকতো না। আহাম্মক আর কাকে বলে! চলো, ফিরে চলো এখান থেকে!'

www.pathagar.com

আবু জেহেল গম্ভীর। এক সময় মুখ খুললো সে! বললো, 'লাত ও উজ্জার শপথ! আমার মনে হচ্ছে তারা আমাদের কাছাকাছি কোথাও আছে। আমাদের কথা তারা শুনছে। তারা দেখছে আমাদেরকে। দেখছে আমাদের সকল কার্যকলাপ। কিন্তু তাঁর কি এক ইন্দ্রজালে আমাদের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে আমরা তাঁদেরকে আদৌ দেখতে পাচ্ছিনে। কী দুর্ভাগ্য আমাদের!

আবু জেহেলদের ব্যর্থ হলো সাওর পর্বতের অভিযান। ব্যর্থ হলো। কিন্তু তাই বলে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকলো না। বরং আরো দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাসূলকে (সা) খোঁজার জন্য।

মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসরত প্রতিটি গোত্রে ঘোষণা দিল, 'কোনো ব্যক্তি যদি মুহাম্মাদকে (সা) জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারে, তবে তাকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে একশটি উন্নত জাতের উট।'

'কুদাইদ' নামক স্থানে বসে আড্ডায় মজেছিল এক যুবক।

নাম- সুরাকা ইবন মালিক। আড্ডায় মশগুল থাকলেও খবরটি প্রবেশ করলো তার কানে। কম কথা নয়! একশো উট!–

লালসার আগুনে জ্বলে উঠলো সুরাকার জিহ্বা।

আড্ডার একজন বললো, 'আল্লাহর শপথ! আমার পাশ দিয়ে এই মাত্র তিনজন লোক চলে গেল। আমার মনে হয় তাদের একজন মুহাম্মাদ, একজন আবু বকর এবং একজন তাদের পথপ্রদর্শক।'

পুরস্কারটি নিজে পাওয়ার জন্য সুরাকা কৌশলের আশ্রয় নিল। বললো, 'কি যা তা বলছো!

ওরা তাদের কেউ নয়। বরং ওরা হচ্ছে অমুক গোত্রের লোক। তাদের হারানো উট তালাশ করে বেড়াচ্ছে।'

লোকটি সরল মনে বললো, 'তা বটে। হলেও হতে পারে!'

এবার সুরাকার পালা।

www.pathagar.com

সুযোগ বুঝে সে চুপে চুপে উঠে পড়লো আড্ডা থেকে।

তারপর সোজা বাড়ি।

বাড়িতে পৌঁছে দাসীকে বললো, 'কেউ যেন দেখতে না পায়, চুপেচুপে এমনভাবে তুমি আমার ঘোড়াটি বেঁধে রেখে এসো অমুক উপত্যকায়।' আর দাসকে বললো, 'এই অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিয়ে বাড়ির পেছন দিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে ঘোড়ার আশপাশে রেখে দেবে, যেন কেউ বুঝতেই না পারে। বুঝতে পেরেছ? যাও, দ্রুত কাজ সার।'

চতুর সুরাকা।

সুরাকা ছিল তার গোত্রের সবচেয়ে দক্ষ ঘোড়সওয়ার, দীর্ঘদেহী, শক্তিশালী, পদচিহ্ন বিশারদ ও বিপদে দারুণ ধৈর্যশীল।

সুরাকার ঘোড়াটিও ছিল উন্নত জাতের।

তেজি।

বর্ম পরে অস্ত্রশাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সুরাকা দাবড়িয়ে দিল তার ঘোড়া।

বাতাসের গতিতে ছুটছে তার ঘোড়াটি।

উদ্দেশ্য, মুহাম্মাদকে (সা) ধরা। আর তার বিনিময়ে একশোটি উট পুরস্কার হিসেবে পাওয়া।

কিন্তু একি হলো! কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ হোঁচট খেল ঘোড়াটি। আর ঘোড়ার পিঠ থেকে দূরে ছিটকে পড়লো সুরাকা। আবার উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে। কিছুদূর যেতে না যেতেই আবারও হোঁচট খেল ঘোড়াটি। ব্যাপার কি! এমন হচ্ছে কেন? নানা ধরনের জিজ্ঞাসা আর অশুভ চিন্তায় মুষড়ে পড়লো সুরাকা। ভাবলো, 'মুহাম্মাদকে (সা) ধরা আমার কাজ নয়। জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়াই হলো।'

কিন্তু একশা উট! এতগুলো উটের লোভে সে আবারও চেপে বসলো ঘোড়ার পিঠে। এবার সামান্য দূরেই দেখতে পেল মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর দুই সাথীকে।

www.pathagar.com

কাছে। খুব কাছে। আর দেরি নয়। সাথে সাথে সে তার ধনুকের দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু হায়! একি হলো! হাতটিও যে আর কাজ করছে না। কেমন অসাড়, কেমন নিস্তেজ। তার হাত আর চললো না।

ওদিকে কী ভীষণ ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দেখলো তার ঘোড়ার পা যেন শুকনো মাটিতে দেবে যাচ্ছে। আর সামনে থেকে প্রচণ্ড ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেললো তাকে ও তার ঘোড়াটিকে। সুরাকা চেষ্টা করলো ঘোড়াটিকে হাঁকিয়ে নিতে। কিন্তু ব্যর্থ হলো। ঘোড়ার পা যেন অনড় পাথর। কেঁপে উঠলো সুরাকার বুক!

করুণ কণ্ঠে আরজ জানালো রাসূলকে (সা) 'আপনার প্রভুর দরবারে দোয়া করুন। আমার ঘোড়ার পা যেন মুক্ত হতে পারে। আমি আপনাদেরকে কোনো ক্ষতি করবো না।'

তার জন্য দোয়া করলেন দয়ার নবীজী (সা)। ক্ষমা করে দিলেন সুরাকাকে ঘোড়াটি মুক্ত হলো।

আবারও লালসার আগুনে জ্বলে উঠলো সুরাকা। চেষ্টা করলো ঘোড়া দাবড়িয়ে তাঁদেরকে ধরার জন্য। কিন্তু সেই একইভাবে আবারও ঘোড়াটির পা দেবে গেল মাটিতে।

পারলো না সুরাকা। পারলো না শত চেষ্টাতেও। পারলো না কোনোভাবেই রাসূলকে (সা) ধরতে।

বরং নিজের জীবনই বিপন্ন দেখে এবার কাতরকণ্ঠে কসম খেয়ে বললো, 'আর নয়! এবারের মত ক্ষমা করে দিন। সত্যিই আমি আপনাদেরকে কোনো ক্ষতি করবো না। দয়া করে আমার ও এই ঘোড়াটির জন্য একটু দোয়া করুন আমরা মুক্ত হলে চলে যাব। আপন গৃহে। আমার অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য-পানীয়, সব-সবই দিয়ে দেব আপনাদের আর মুক্তি পেলে আমি আমার

www.pathagar.com

পেছনের ধাবমান সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। কিংবা হটিয়ে দেব অন্য দিকে।'

রাসূলসহ তাঁরা বললেন, 'তোমার কোনো কিছুরই আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে কথা দাও, পেছনে ধাবমান লোকদেরকে তুমি আমাদের থেকে দূরে হটিয়ে নিয়ে যাবো!'

'অবশ্যই। একশো বার।' সুরাকা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করলো।

এবার রাসূল (সা) তার জন্য দোয়া করলেন।

মুক্ত হলো সুরাকা আর তার ঘোড়া। সে ফিরে যাওয়ার সময় রাসূল (সা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে বললো, 'আপনারা একটু থামুন। আমার কিছু কথা আছে। আল্লাহর কসম! আমি কোনো ক্ষতি করবো না।'

'তুমি আমাদের কাছে কি চাও?'

সুরাকা বললো, আল্লাহর কসম হে মুহাম্মদ! আমি নিশ্চিত জানি শিগগিরই আপনার দীন বিজয় হবে। আমার সাথে আপনি ওয়াদা করুন, আমি যখন আপনার সাম্রাজ্যে যাব, আপনি তখন আমাকে সম্মান দেবেন।

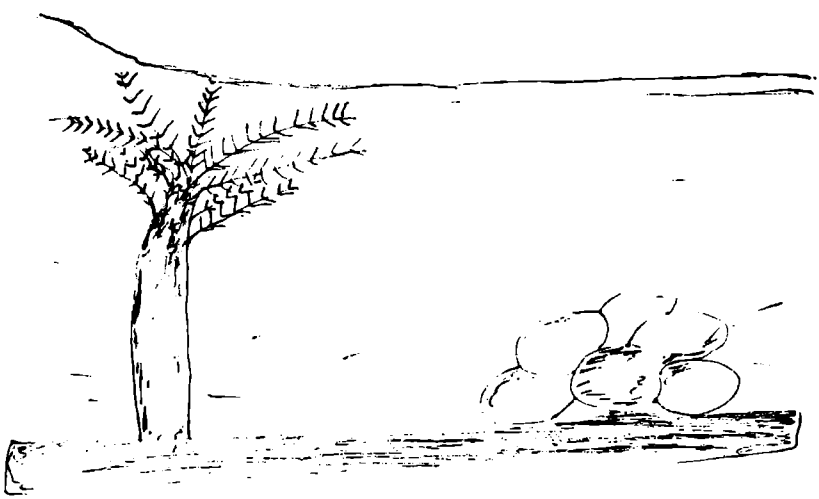

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, দেব।'

'তাহলে এ কথাটি একটু লিখে দিন।'

রাসূল (সা) একখণ্ড শুকনো হাড়ের ওপর আবু বকরকে (রা) কথাগুলো লিখতে বললেন।

লেখা শেষ হলে সেটা নিয়ে সুরাকা চলে যাচ্ছে।

রাসূল (সা) তাকে ডেকে বললেন, 'সুরাকা তুমি যখন কিসারার রাজকীয় পোশাক পরবে তখন কেমন হবে?'

বিস্ময়ের সাথে সুরাকা ফিরে দাঁড়ালো। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কিসরা ইবন হুরমুয?'

রাসূল (সা) বললেন, 'হ্যাঁ, কিসরা ইবন হুরমুয।'

অবিশ্বাস্যের মত শুনালেও কেঁপে উঠলো সুরাকা। একবুক খুশি আর বিস্ময় নিয়ে পেছনে ফিরে গেল সে। পথে যারা রাসূলকে (সা) খোঁজার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল, তাদেরকে সে সত্যিই ফিরিয়ে দিল। আর রাসূলের (সা) কথাটি চেপে রাখলো ততদিন, যতদিন না তার ধারণা ছিল, রাসূল (সা) মদিনা পৌঁছে গেছেন।

এক সময় আবু জেহেলের কানে গেল কথাটি। সে সুরাকাকে ভীষণভাবে তিরস্কার করলো। আবু জেহেলের তিরস্কারে দুলে উঠলো সুরাকার কবিহৃদয়। কবি হিসেবেও তার সুনাম ছিল। আবু জেহেলের তিরস্কারের জবাবে আবৃত্তি করলো ঃ

'আল্লাহর শপথ, তুমি যদি দেখতে আবু হিকাম,
আমার ঘোড়ার ব্যাপারটি, যখন তার পা ডুবে
যাচ্ছিল, তুমি জানতে- এবং

www.pathagar.com

তোমার কোনো সংশয় থাকতো না,

মুহাম্মাদ প্রকৃত রাসূল–

সুতরাং কে তাঁকে গতিরোধ করে?'

সময় গড়িয়ে যায়।

এক সময় মক্কা বিজয় করলেন রাসূল (সা)। মক্কা বিজয়ের পর, সুরাকা ছুটে এলেন রাসূলের (সা) কাছে।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে সুরাকা রাসূলের (সা) দেয়া প্রতিশ্রুতির স্মারক হিসেবে সেই হাড়টি বের করে দেখালেন।

রাসূল (সা) সুরাকাকে বললেন, 'এস। আমার কাছে এস। আজ প্রতিশ্রুতি পালন ও সদ্ব্যবহারের দিন।'

সুরাকা খুশি আর প্রশান্ত হৃদয়ে রাসূলের (সা) কাছে গেলেন। এবং তারপরই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।

কী আশ্চর্য!

এই সুরাকা সত্য সত্যই কিসরার রাজকীয় পোশাক পরার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যেন রাজ পোশাক নয়– সে এক জরিদার জমিন।

সেটা ছিল খলিফা উমরের (রা) সময়ে।

প্রকৃতঅর্থে, সত্যের পথে চলেন যিনি,কার সাধ্য আছে গতিরোধ করে তার?

সত্যের বিজয় ও পুরস্কার- সে এক বিশাল ব্যাপার। কী আর আছে সত্যের সমান? মিথ্যার সীমানা আছে, কিন্তু সত্যের শক্তিও সীমানা অসীম।

www.pathagar.com

জীবনের আগে যে প্রাণ জাগে

ছেলেটির বয়স মাত্র দশ বছর। যেমন তার স্বাস্থ্য, তেমনি সুন্দরের আলোয় উজ্জ্বল তার চেহারা। টগবগে এক বালক।

মদীনার ঘরে ঘরে এখন চলছে এক অন্যরকম উৎসবের আয়োজন। রাস্তাঘাটেও তার ঢল নেমেছে। ব্যাপার কী? উৎসুক বালক। চেয়ে থাকে বড়দের হাসি খুশি ভরা মুখের দিকে। জানার চেষ্টা করে উৎসবের কারণ।

এক সময় জানতে পারে। জানতে পারে আসছেন, আসছেন আলোকের সভাপতি, ধবল জোছনার সম্রাট- মহানবী (সা)।

তিনি আসছেন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায়! তাঁরই জন্য উদগ্রীব মদীনাবাসী। তাঁরই জন্য পুলকিত মদীনার আকাশ-বাতাস। বৃক্ষতরু, খেজুর বাগান, পাহাড়-পর্বত এবং মরুভূমির প্রতিটি ধূলিকণা।

www.pathagar.com

গোটা পরিবেশ যখন উৎসবমুখর, তখন তাতে যোগ দিয়েছে ছোটরাও।

দলে দলে ছোট্ট কচিপ্রাণ- সোনামুখ ছেলেমেয়েরা আনন্দে বিভোর। গান গাচ্ছে বুলবুলির মত পথে পথে জটলা পাকিয়ে। দল বেঁধে। ছোট্ট বালকটিও আর স্থির থাকতে পারলো না।

সেও এখন ছোট ছোট জোছনার কুঁচিদের মাঝে।

সেও সমানে পুলকিত। শিহরিত।

ভাবছে বালক। কেবলই ভাবছে–

আহ! কী সৌভাগ্য আমাদের! কী সৌভাগ্য মদীনাবাসীর! রাসূল (সা) আসছেন!

তিনি আসছেন আমাদের মাঝে! এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কী হতে পারে!

এক সময় এলেন তিনি।– মদীনার রাস্তায় পা রাখলেন দয়ার নবীজী (সা)। তখনকার দৃশ্য তো আর ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়!

কী যে আনন্দ ও আবেগঘন মদীনার প্রতিটি প্রান্তর!

ছোট্ট ছেলেমেয়েরা গানের সুরে সুরে সাদর স্বাগত জানাচ্ছে নবীকে (সা)। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে দশ বছরের বালকটিও। সবার কণ্ঠেই মিষ্টি-মধুর সুর ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে ক্রমাগত বাতাসের পর্দা ফাঁক করে দূরে, বহু দূরে-'তালাআল বাদরু আলাইনা'...,

মদীনার কে না জানে, রাসূল (সা) তাদের মাঝে এসেছেন! তবুও আবেগের বাতাসে দোল খেতে খেতে ছোটরা গানের সুরে সুরে মদীনার প্রতিটি গৃহে গৃহে পৌঁছে দিচ্ছে রাসূলের আগমনের আনন্দবার্তা।

রাসূল (সা) মদীনায় পা রাখতেই মুহূর্তেই সজীব হয়ে উঠলো গোটা মদীনা।

যেন প্রাণ ফিরে পেল মদীনা। এ যেন বহু প্রতীক্ষার পর স্বস্তির বৃষ্টি! রাসূলের (সা) চারপাশে মানুষের ঢল। সে ঢল বন্যার চেয়েও প্রবল। এক সময় ভিড় কমে এলো।

রাসূলও (সা) একটু সময় নিয়ে স্থির হলেন। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। ঠিক এমনি এক চমৎকার সময়ে রাসূলের (সা) কাছে এলেন একজন মহিলা। এক হাতে ধরে রেখেছেন একটি বালককে।

বড় আদরে। বড় মমতায়। রাসূল (সা) বুঝলেন, ইনিই বালকটির মা। এবার মা ধীরে, খুব ধীরে রাসূলকে (সা) বললেন, হে দয়ার নবী (সা)! আপনি মদীনায় আসার সাথে সাথেই আনসারদের প্রত্যেক্ষ নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু উপহার দিয়েছে। আমি গরিব, অত্যন্ত গরিব মানুষ। আপনাকে কী আর দেবো! কিন্তু আপনাকে একটা কিছু উপহার দেয়ার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে আছে। মনের ভেতর উথাল-পাতাল ঢেউ বয়ে চলেছে। আপনাকে দেয়ার মতো কোনো বিষয়-সম্পত্তি নেই আমার। আছে কেবল আমার কলিজার টুকরো, নয়নের মনি ছেলেটি। নিন, নিন দয়ার নবী (সা)! তাকেই আপনার হাতে উপহার হিসেবে তুলে দিচ্ছি। ছেলেটি লিখতে পারে। আপনার কাজেও সাহায্য করতে পারবে। একে গ্রহণ করুন, তাহলে আমার তৃষিত বুকটাও শান্ত হবে। এ এক বিরল উপহার!

অসামান্য উপহার! যে উপহারের কোন তুলনা হয় না। রাসূল (সা) খুশি হয়ে বালকটিকে কাছে টেনে নিলেন। আদর করলেন।

তারপর।

তারপর থেকেই বালকটি রয়ে গেল রাসূলের (সা) কাছে। রাসূলের (সা) একান্ত সান্নিধ্যেই সময়, দিন ও কাল কাটে বালকটির।

রাসূলের (সা) একান্ত কাছে-পিঠে থাকতে পেরে সেও দারুণ খুশি!

যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছে। যেন মহাসাগর পেয়েছে। পেয়ে গেছে পৃথিবীর তাবৎ মহা মূল্যবান সম্পদ। তার খুশির কোনো সীমা নেই। দিন যায়। মাস যায়। বছরও যায়। রাসূলের (সা) কাছেই আসে সে। রাসূলের (সা) সকল প্রয়োজনেই আছে সে। রাসূলের (সা) খেদমতেই নিয়োজিত রেখেছে নিজেকে। এভাবেই তো কেটে গেল একে একে দশটি বছর!

বালক থেকে কিশোর। কিশোর থেকে এখন সে দুরন্ত এক যুবক। তার কণ্ঠেই একদিন শোনা গেল ঃ 'আমি দশ বছর যাবৎ একাধারে রাসূলকে (সা)

খেদমত করেছি। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কোন দিন কিংবা কখনোই রাসূল (সা) আমাকে মারেননি। এমনকি মুখ কালোও করেননি!

রাসূল (সা) আমাকে নিয়েই, সেই প্রথম দিন যে কথাটি বলেছিলেন সেটি হলো–

'তুমি আমার গোপন কথা গোপন রাখবে। তা হলেই তুমি ঈমানদার হবে।'

আমি রাসূলের (সা) এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। অন্য কারো কাছে তো দূরে থাক, আমার মাকে পর্যন্তও কখনো রাসূলের (সা) গোপন কথা বলিনি।'

রাসূলও (সা) তার জন্যপ্রাণ খুলে দোয়া করতেন।

তাকে অনেক, অনেক বেশি আদর ও স্নেহ করতেন।

একবার রাসূল (সা) তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন– 'হে আল্লাহ! তার ধন সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি দান করুন। এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।'

রাসূলের (সা) দোয়া বলে কথা!

রাসূলের (সা) প্রতিটি দোয়াই আল্লাহপাক কবুল করেছেন।

একদিনের সেই বালকটি বড় হয়ে রাসূলের সান্নিধ্যে থেকে নিজেকেও গড়ে তুলেছিলেন একজন যোগ্য মুমিন হিসেবে। যার মধ্যে ছিল ঈমান, আল্লাহ ভীতি, রাসূলের সাহস, দক্ষতা, ক্ষীপ্রতা, নমনীয়তা, ভদ্রতা, কোমলতা এবং ধৈর্যের অসীম গুণ।

রাসূলের (সা) কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন সকল আদব-কায়দা, সুন্দর আচরণ। 'উত্তম নৈতিকতা জান্নাতের কাজ'- রাসূলের (সা) এই কথা, তিনি সকল সময় মেনে চলতেন। আর এ জন্যই তো তিনি পরিশেষে পরিণত হয়েছিলেন সোনার মানুষে।

এই বিরল সৌভাগ্যবান জান্নাতি আবাবিলের নাম-আনাস, আনাস ইবনে মালিক (রা)। রাসূলের (সা) পরশে তার জেগেছিল প্রাণ। সফল এবং মহৎ হয়েছিল জীবন। তাঁর মত এমনি ভাগ্য, এমনি জীবন- সে যে আমাদের জন্য বড় কামনার! বড়ই লোভনীয়!

www.pathagar.com

আগুন-নদীতে সাঁতার

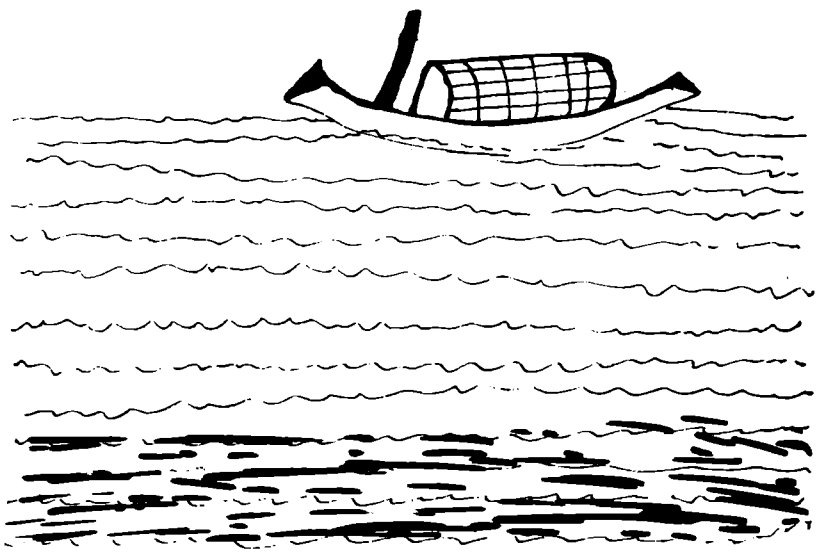

মক্কা!

কি চমৎকার একটি শহর! এই মক্কায় আশ্রয়

নিয়েছেন মিকদাদ ইবন আমর!

আছেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে। কিন্তু তার হৃদয়

এবং দৃষ্টিটা ছিল উন্মুক্ত।

মক্কা!

মক্কা তখন আলোর বিভায় আলোকিত হয়ে উঠছে ক্রমশ। কারণ ততোদিন রাসূল (সা) তাওহিদের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন চারদিকে! কিন্তু গোপনে।

www.pathagar.com

গুটি কয়েক মানুষের মাঝে মাত্র।

মিকদাদের চারপাশে অন্ধকার।

কিন্তু তার ভাল লাগে না সেই কুৎসিত পরিবেশ। কেমন বেরহম সবাই।

কেবলি হানাহানি আর রক্তারক্তি। অশান্তির সয়লাব। অনাচারের প্লাবণ।

মুক্তির উপায় কি?

ভাবেন মিকদাদ।

ভাবতে ভাবতেই একদিন আকস্মিকভাবে জেনে গেলেন।

জেনে গেলেন রাসূলের (সা) কথা।

তাঁর দীনের দাওয়াতের কথা।

জেনে গেলেন, যত সুখ আর নিরাপত্তা- সে কেবল আছে এইখানে, আল্লাহর দীনের ভেতর।

তবে আর দেরি কেন?

না। দেরি নয়।

মিকদাদ ছুটে গেলেন রাসূলের (সা) কাছে। তারপর গ্রহণ করলেন ইসলাম।

ইসলাম গ্রহণ করে তিনি মিথ্যার কুহক থেকে মুক্তি লাভ করলেন।

ভাগ্যবান মনে করলেন নিজেকে।

যখনই কালেমা পাঠ করলেন মিকদাদ, তখনই তার বুকের ভেতর প্রবেশ করলো এক প্রশান্তির বাতাস। আর সেই সাথে তুমুল ঢেউ তুললো সাহসী তুফান।

ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছে মক্কায়।

গোপনে গোপনে।

কিন্তু না। মিকদাদ এতে সন্তুষ্ট নন। নিজের বিবেক এবং সাহসের সাথেই যেন লুকোচুরি খেলা। এটা তার পছন্দ নয়। তিনি সরাসরি, সবার সামনেই ঘোষণা দিতে চান ইসলামের দাওয়াত।

www.pathagar.com

আল্লাহর বাণী, রাসূলের বাণী, সত্য ও সঠিক পথের দিশা- সুতরাং সেখানে আমার লুকোচুরির কি আছে? হোক না বৈরী পরিবেশ! তবুও সাহসে বুক বাঁধতে হবে।

সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে আবার কীসের ভয় ? অসামান্য সাহসী মিকদাদ।

ভয় নয়। শঙ্কা নয়। দ্বিধা বা সঙ্কোচও নয়। তিনি সরাসরি মক্কায় ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিলেন। কারুর ভয়ে তিনি ভীতু নন। মক্কায় তখন চলছে দুশমনদের অকথ্য নির্যাতন। যারাই সত্যপথের সাথী হচ্ছেন তাদের ওপরই চলছে নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার। কেউই রেহাই পাচ্ছেন না কাফেরদের হিংস্র থাবা থেকে। মিকদাদও জানেন সে কথা। তারপরও তিনি তার সিদ্ধান্তে অনড়। যেন সে এক হেরার পর্বত। মিকদাদ প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন মক্কায়। মানুষকে ডাকছেন এক আল্লাহর পথে। ইসলামের পথে রাসূলের (সাঃ) পথে। কাজটি খুবই কঠিন। শত্রুরা খুবই কঠিন। শত্রুরা ক্ষেপে গেলে মুহূর্তেই। কাল যারা ছিল কাছের মানুষ, আপনজন- তারাও দাঁড়িয়ে গেল মিকদাদের বিরুদ্ধে।

যারা তাকে আগে ভালো বলতো, প্রশংসা করতো, তাদের মুখেও এখন অশ্রাব্য গালি। তাদের হাতে ফুলের বদলে এখন উঠে এসেছে চকচকে তরবারি।

কি এক দুঃসহ কঠিন পরীক্ষার কাল!

এই দুঃসহ রক্তনদী আর আগুনের পর্বত টপকে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলছেন দুঃসাহসী কতিপয় সিংহদিল, সত্যপ্রাণ মুজাহিদ।

রাসুল (সাঃ) আছেন তাঁদের সাথে।

শুধু সাথেই নয়। রাসূলই (সাঃ) তাদের মহান সেনাপতি।

পথ প্রদর্শক।

www.pathagar.com

মক্কার সেই ঘোরতর কঠিন সময়ে মাত্র সাতজন সাহসী পুরুষ প্রকাশ্যে ঈমান গ্রহণের কথা ঘোষণা দিলেন। কাজ করে যাচ্ছেন জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে সত্যের পক্ষে।

এই সাতজনের প্রথম জনই হলেন মহান সেনাপতি স্বয়ং রাসূলে মকবুল (সাঃ)

আর তার বাকি ছয়জন হলেন হজরত আবু বকর, হজরত বিলাল ও হজরত মিকদাদ। তাঁরা কেউই পরওয়া করলেন না কাফেরদের অত্যাচার, নির্যাতন, হুমকি কিংবা প্রাণনাশের।

মক্কায় সেই সন্ত্রাসী কঠিন সময়ে প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়াটা সহজ ব্যাপার ছিল না। এ ছিল এক অসীম সাহসের কাজ। একমাত্র আল্লাহকে যারা পরম নির্ভরযোগ্য অভিভাবক, প্রভু বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন, কেবল তারাই একমাত্র সাহসী ভূমিকা রাখতে পারেন।

ইসলাম গ্রহণের পর মিকদাদ সম্পূর্ণ বদলে গেলেন।

এ যেন রাতের পর সূর্যের উদয়। ঝলমলে দিনের শুভাগমন।

কিন্তু কাফেরদের বুকের জ্বালা এতে করে বেড়ে গেল অনেক গুণে।

তারা এবার আরও কঠিন ও হিংস্র হয়ে উঠলো। প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেয়ার কারণে মিকদাদের ওপর নেমে এলো কাফেরদের নির্যাতনের অগ্নিবৃষ্টি। মুষলধারায়।

রাসূল (সঃ)। এক দয়ার সাগর।

তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবীর এই নির্যাতন দেখছেন। নবীজীর (সাঃ) বুকটা বেদনায় ভারী হয়ে উঠলো। তিনি মিকদাদকে হিজরতের নির্দেশ দিলেন।

রাসূলের (সা)

নির্দেশেই হিজরতে বাধ্য হলেন মিকদাদ।

হিজরি দ্বিতীয় সন।

www.pathagar.com

এই সময়ই শিরক ও তাওহিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হয়।

কুরাইশ বাহিনী পৌঁছে বদরপ্রান্তর । রাসূল (সাঃ) বুঝলেন, সামনেই কঠিন সময়। তিনিও বদর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন তাঁর প্রিয় সাথীদের। এটা ছিল সাহাবীদের জন্য প্রথম পরীক্ষার ক্ষেত্র।

সেনাপতি স্বয়ং রাসূল (সাঃ)। তিনি তাঁর প্রিয় সাথীদের ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাইলেন যুদ্ধে যাওয়ার আগেই।

রাসূল (সা)। পরামর্শ চাইলেন সাহাবীদের কাছ থেকে। যুদ্ধের ব্যাপারে। উপস্থিত সাহাবীরা তাদের নিজ নিজ অভিমত ও রণকৌশল অকপটে ব্যক্ত করলেন রাসূলের (সাঃ) সামনে। হজরত আবুবকর ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সহ তাদের আত্মত্যাগ ও কুরবানির বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মিকদাদও উপস্থিত আছেন।

এবার তার পালা।

তিনি এবার এক আবেগময় ভাষণে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এগিয়ে চলুন। আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম! বনি ইসরাইলরা তাদের নবী মূসাকে (আঃ) বলেছিল : 'তুমি ও তোমার রব দু'জন যাও এবং যুদ্ধ কর। আর আমরা এখানে বসে থাকি।' – আমরা আপনাকে তেমন কথা বল না। বরং আমরা আপনাকে বলবো, আপনি ও আপনার রব দুজন যান ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আমরাও আপনাদের সাথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যিনি সত্যসহ আপনাকে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার কসম, আপনি যদি আমাদের 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্ত নিয়ে যান, আমরা আপনাদের সাথে যাব এবং আপনার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে সকল দিক থেকে যুদ্ধ করবো। যতক্ষণ না আল্লাহ আপাকে বিজয় দান করেন।'

মিকদাদের এই দুঃসাহসী উচ্চারণে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রাসূলের (সাঃ) বদন মুবারক।

www.pathagar.com

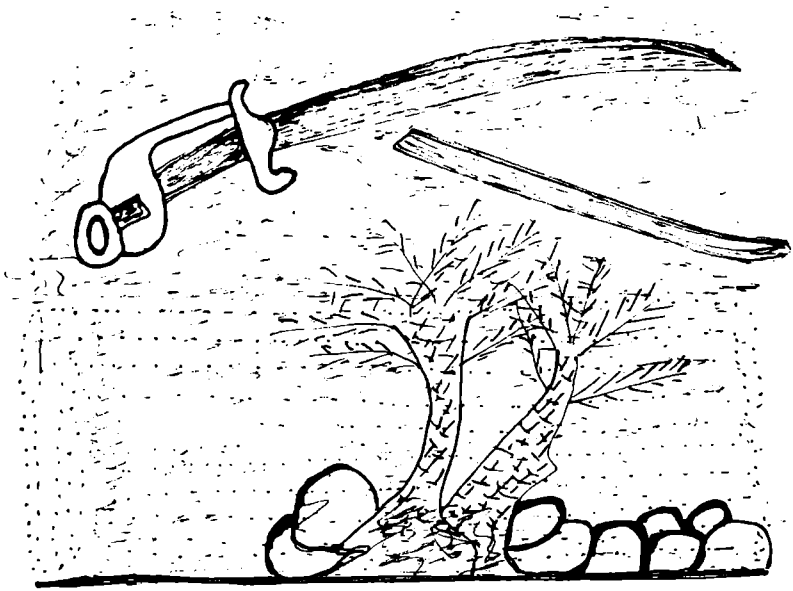

শুরু হলো বদর যুদ্ধ!

সত্যিই মিকদাদ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন যুদ্ধের ময়দানে। শত্রুদের মুকাবেলায় সেদিন, বদরপ্রান্তরে মিকদাদ ছিলেন দুর্দান্ত এক সাহসের ফুলকি। বারুদের তেজ!

বদর যুদ্ধে একমাত্র মিকদাদই ছিলেন অশ্বারোহী মুজাহিদ। এ কারণে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

'একমাত্র মিকদাদই সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়া ছুটিয়েছেন।'

এটা তার জন্য সৌভাগ্যে বিষয়ও বটে। বলা যায় এক বিরল সম্মাননা।

বদর ছাড়াও, খন্দকসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে মিকদাদ অংশগ্রহণ করেছেন।

আর প্রতিটি যুদ্ধে রেখে গেছেন তার সাহস, ত্যাগ ও কুরবানির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হজরত খুবাইবকে মক্কার কুরাইশরা শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো নৃশংসভাবে।

www.pathagar.com

খুবাইবের (রাঃ) লাশ রাতের আঁধারে শূল থেকে নামিয়ে আনার জন্য রাসূল (সাঃ) পাঠালেন যুবাইর ও মিকদাদকে। তারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ পালনে ছুটে গেলেন এবং সত্যিসত্যিই রাতের আঁধারে খুবাইবের লাশ শূল থেকে নামিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে রওয়ানা দিলেন।

এ ধরনের দুঃসাহস ও ত্যাগের নজির মিকদাদের জীবনে রয়েছে গেছে অজস্র।

ইসলাম গ্রহণের কারণে মুখোমুখি হয়েছেন অভাব ও দারিদ্যের। সহ্য করেছেন অকথ্য নির্যাতন।

জীবনে নেমে এসেছে কত ধরনের অগ্নি পরীক্ষা!

সারাটি জীবন কেটেছেন আগুন-নদীতে সাঁতার!

তবুও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এতটুকু টলেনি তার ঈমানের পর্বত।

কেন টলেনি?

তিনি তো তার জীবনের জন্য একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলকেই (সঃ) গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তার আর কিসের ভয় ?

কিসের পরওয়া?

হজরত মিকদাদ!-

মূলত তিনি ছিলেন রাসূলের (সঃ) আদর্শে উজ্জীবিত, ইসলামের এক মহান সাহসী সৈনিক।

আর আমাদের কাছে তো তিনি প্রেরণার এক জ্বলন্ত উপমা।

সাহসের সোনালি সৈকত। রূপোলি জোছনা।

www.pathagar.com

মহৎ মহান

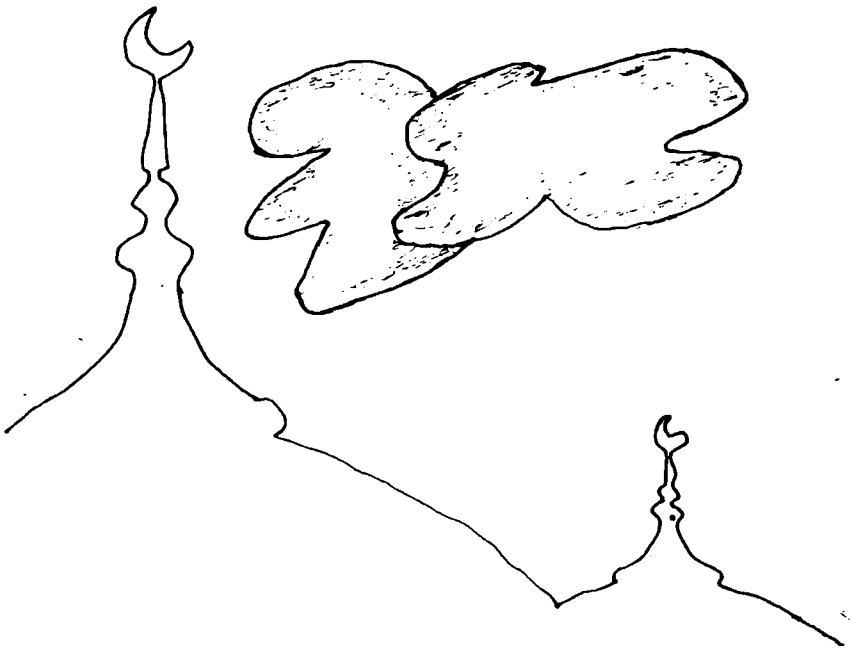

নবী মুহাম্মাদ (সা)!

মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামানব।

নবীদের (আ) মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী।

আলোর নবী। জ্যোতির পরশ।

সকল গুণের সমাহারে এক অতুলনীয় পরশপাথর।

তিনি শিক্ষকের শিক্ষক। মহান শিক্ষক। তাঁর মতো দরদি এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষক তাঁর আগেও কেউ আসেননি, পরেও না।

www.pathagar.com

আগামীতেও আসবেন না আর তেমন শিক্ষা।

কেমন করে আসবেন?

রাসূলই (সা) তো মানবজাতির জন্য সর্বশেষ শিক্ষক। আল্লাহ পাক নিজেই গ্রহণ করেছেন রাসূলের (সা) শিক্ষার দায়িত্ব। একেবারে সরাসরি।

আল্লাহর দেয়া শিক্ষায় তিনি ছিলেন শিক্ষিত। সেই শিক্ষাতেই হয়েছিলেন আলোকিত। হয়েছিলেন উদ্ভাসিত। যেমন আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন–

"হে নবী, আমি আপনাকে এমন সব জ্ঞান দান করেছি- যা আপনিও জানতেন না এবং আপনার পূর্বপুরুষও জানতো না।"

সত্যিই তাই।

রাসূল (সা) আল্লাহপ্রাপ্ত সেই জ্ঞান কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি।

তিনি তাঁর শিক্ষা এবং জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে তুলেছিলেন তাঁর গোটা জাতিকে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন যে আরব- যে আরবের ফোকর গলিয়ে আলো প্রবেশের কোনো সুযোগই ছিল না- সেই অন্ধ জাতির ঘরে ঘরে তিনি জ্বালিয়ে দিলেন শিক্ষার এক আশ্চর্য আলোকপ্রদীপ।

কেন করবে না? তিনি তো নিজেই বলছেন–

"আমি মানুষ ও মানবতার জন্য শিক্ষকরূপে জগতে প্রেরিত হয়েছি।"

সুতরাং এ থেকেই তো স্পষ্ট হয়ে যায় যে মহানবী (সা) সমগ্র মানুষকে শিক্ষার আলোয় উদ্দীপ্ত করার জন্যই সারাটি জীবন সচেষ্ট ছিলেন।

রাসূল (সা) শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়েছিলেন যুগান্তকারী কত না সাহসী পদক্ষেপ!

দয়ার নবীজী (সা) নিরক্ষরতা কিংবা মূর্খতা কখনই পছন্দ করতেন না।

তাঁর বুকে সকল সময় বেলের কাঁটার মতো বিদ্ধ হতো নিরক্ষরতার কষ্ট।

www.pathagar.com

তিনি কেবলই ভাবতেন–

কেন মানুষ মূর্খ থাকবে?

কেন মানুষ নিরক্ষর থাকবে?

কেন মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাবে? মানুষ তো এসেছে জগৎকে আলোকিত করার জন্য।

এই পৃথিবীকে উর্বর করার জন্য।

মানবতার ফুলে-ফসলে ভরে তোলার জন্য। নিরক্ষর কিংবা মূর্খ মানুষের পক্ষে কি সেটা কখনো সম্ভব?

কক্ষনো নয়।

ভাবেন দয়ার নবীজী (সা)।

ভাবেন আর তাঁর কর্মকৌশল কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন।

কিভাবে মানুষকে জ্ঞানেও শিক্ষায় উন্নত করা যায়!

কিভাবে তাদেরকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করা যায়!

কিভাবে তাদের মধ্যে বিশ্বাস, চিন্তা এবং কর্মের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যায়!

না, শিক্ষা ছাড়া এর কোনো বিকল্প পথ নেই।

রাস্তা নেই।

দরোজা নেই।

মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত এবং আলোকিত করতে পারলেই তো জাতি আলোকিত হয়! আর জাতি আলোকিত হওয়া মানেই তো দেশ, মহাদেশ এবং গোটা পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠা।

রাসূল (সা) এটা খুব ভালোভাবেই বুঝলেন যে, শিক্ষাই হলো সকল কিছুর মূল।

একমাত্র শিক্ষাই হলো সকল কিছুর চেয়ে অনেক দামি।

শিক্ষার অভাবেই তো মানুষ ভুল করে। বেপথু হয়। অন্যায় করে।

আহ, কত না পাপের মধ্যে জড়িয়ে যায়! সুতরাং তাদের মুক্তির একমাত্র পথ হলো- শিক্ষা।

www.pathagar.com

শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

থাকতে পারে না।

রাসূল (সা) খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন এটা।

তাই তিনি গ্রহণ করলেন এবার বাস্তব পদক্ষেপ।

সেটাও ছিল এমন এক বিরল পদক্ষেপ- যা পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত আর কেই তেমনটি করতে পারেননি।

সেটা ছিল এক অভিনব মডেল!

আশ্চর্য এক পদক্ষেপ!

ইতিহাসে এমন নজির আর দ্বিতীয়টি নেই।

সেটা কি?

এলো বদর যুদ্ধ!

বদর যুদ্ধ মানেই তো এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ! এই যুদ্ধের মহান সেনাপতি ছিলেন রাসূল (সা)।

যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হলেন।

পরাজিত হলো আল্লাহর দুশমনরা। তাদের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হলো অনেকেই। সংখ্যায় সত্তর জন।

তারা ছিল যেমনি নেতৃস্থানীয়, তেমনি শিক্ষিত।

রাসূল (সা) ভাবলেন- এই তো চমৎকার সুযোগ!

তিনি রক্তের বদলা না নিয়ে তাদেরকে মুক্তিপণের শর্ত দিলেন।

সেই শর্তটি ছিল অভিনব এক শর্ত।

তাদেরকে বলা হলো- তোমরা বন্দী। ইচ্ছা করলে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে পারতাম।

রক্তের বদলা নিতে পারতাম।

কিন্তু না, আমরা সেটা করিনি।

করবোও না।

www.pathagar.com

বরং আমরা তোমাদেরকে মুক্তি দিতে চাই। তোমাদের মুক্তির জন্য শর্ত হলো তোমরা প্রত্যেকেই দশজন নিরক্ষর মানুষকে লেখাপড়া শেখাবে।

তাদের লিখতে শেখাবে। পড়তে শেখাবে। শিক্ষার প্রকৃত জ্ঞানে তাদেরকে আলোকিত করে তুলবে।

যদি সেটা পারো, তাহলে তোমাদের দায়িত্ব পালন শেষেই তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।

বন্দীদের চোখে-মুখে বিস্ময়!-

এ কেমন মুক্তিপণ?

রক্ত নয়, অর্থ নয়, সম্পদ নয়, রাজ্য নয়- অক্ষর জ্ঞান দেয়া!

লেখাপড়া শেখানো?

মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা! এ আর তেমন কষ্টের কাজ কি!

রাসূলের (সা) প্রস্তাবে তারা অবাক হয়ে গেল। খুশিতে ডগমগ করে উঠলো তাদের চোখ। তারা মনে করলো- ভয়ঙ্কর, কঠিন কোনো শাস্তি নয়- বরং এটি তো আমাদের জন্য পুরস্কার!

এ কেমন মুক্তিপণ!

রাসূলের (সা) প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার বৃষ্টি ঝরতে থাকলো মুষলধারায়। তারা একবাক্যে সহাস্যে রাজি হয়ে গেল। বললো, আমরা প্রস্তুত হে রাসূল (সা)! প্রস্তুত এমনই একটি মহৎ কাজের জন্য। এতে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য রাসূল (সা) পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন।

সুযোগ যখন এলো তখন তিনি সেটা কাজে লাগালেন।

যুদ্ধবন্দী চরম দুশমনদের তিনি শিক্ষকের মতো বিশাল মর্যাদা দিয়ে মদিনায় পাঠালেন।

সত্তরজন বন্দী প্রত্যেকেই দশজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয়ার কাজে লেগে গেল।

শুরু হয়ে গেলে রাসূল (সা) প্রবর্তিত নিরক্ষরতা দূরীকরণের এক বৈপ্লবিক কর্মসূচি।

www.pathagar.com

বন্দীদেরকে শিক্ষক হিসেবে মদিনায় নিযুক্ত করেই নবীজী (সা) ক্ষান্ত হলেন না।

গোটা আরব জাতির সামনে তিনি একের পর এক জ্বালিয়ে চললেন শিক্ষামূলক আলোর চেরাগ।

তিনি আল কুরআনের আয়াত তুলে ধরেন আরবের মূর্খ, বর্বর এবং অসভ্য জাতির সামনে।

উদ্দেশ্য তো একটাই- তাদেরকে শিক্ষিত করে সভ্য জাতিতে পরিণত করা, গোটা আরব জাতিকে।

রাসূল (সা) জাতির সামনে আল কুরআনের ভাষ্য তুলে ধরলেন,

"যাকে জ্ঞান-প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাকে মহা কল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে।"

তিনি আবারও শোনালেন তাদেরকে আল্লাহর বাণী, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞানী, আল্লাহপাক তাদের মর্যাদা সুউচ্চ করে দেবেন।"

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে আরব জাতির মুক্তির জন্য রাসূল (সা) নিজেই 'দারুল আরকাম' পরিচালনা করেন।

তিনি নিজেই সেটা তত্ত্বাবধান করতেন। যেটা ছিল ঐতিহাসিক সাফা পর্বতের পাদদেশে।

ইতিহাসে এটিই ছিল বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বয়ং রাসূল (সা) পরিচালিত প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মদিনায় আবু উমামা ইবন যুবাইরের (রা) বাড়িতেও রাসূল (সা) একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

মুসয়াব ইবন উমাইরকে (রা) রাসূল (সা) এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।

রাসূলের (সা) দেয়া শিক্ষানীতি ও দর্শনের আলোকে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতে থাকে।

রাসূলের (সা) হিজরতের পর মদিনার বহুসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেন। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত এটাই প্রথম দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

মদিনার দ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি রাসূল (সা) প্রতিষ্ঠিত করেন আবু আইউব আনসারীর (রা) নিজস্ব বাসভবনে।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাসূল (সা) নিজেই দীর্ঘ আটটি বছর যাবৎ শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করেন।

নিরক্ষরতা দূর করার জন্য, মানুষকে সঠিকভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য রাসূল (সা) মসজিদভিত্তিক আবাসিক শিক্ষাকার্যক্রমও শুরু করেন।

হিজরি দ্বিতীয় সনে রাসূল (সা) আরও একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

এর নাম ছিল- 'দারুল কোবরা'।

এভাবে, হ্যাঁ ঠিক এভাবেই রাসূল (সা) যখন যেখানে যেমন অবস্থানেই ছিলেন তখন সেখানেই শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন।

রাসূলের (সা) আদর্শ অনুসরণ করে সাহাবায়ে কিরামও (রা) একইভাবে শিক্ষা বিস্তারে রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

আমরাও পারি।

নিশ্চয়ই পারি তেমনটি করতো- আমাদের চারপাশের শিক্ষাবঞ্চিত নিরক্ষর মানুষের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলতে।

আমরাও যদি রাসূলের (সা) শিক্ষাসম্প্রসারণের নীতি, আদর্শ ও বাস্তব কর্মকৌশল গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে যাই, তাহলে দেখা যাবে আমাদের চারপাশে আর কেউ নিরক্ষর মানুষ নেই।

মূর্খ নেই।

এর জন্য প্রয়োজন শুধু ইচ্ছাশক্তির।

প্রয়োজন শুধু উদ্যোগের।

ব্যাস! এইটুকু হলেই আমরা পরিকল্পিতভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি।

চারপাশের মানুষকে যদি সঠিক শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত করে তুলতে পারি, যদি তাদেরকে যথাযথ জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে পারি, তাহলে দেখবো ভালো মানুষের সংখ্যা কতগুণে বেড়ে গেছে!

www.pathagar.com

কতগুনে বেড়ে গেছে আলোকিত মানুষ!

সৎ, জ্ঞানী এবং শিক্ষিত মানুষ বেড়ে গেলে তখন বন্ধুর সংখ্যাও তো বেড়ে যাবে!

কমে আসতে শত্রুর সংখ্যা।

কমে আসবে হিংসা, হিংস্রতা, বিদ্বেষ এবং খারাপের পরিমাণ।

আর তখন আমাদের এই চারপাশ, আমাদের এই সমাজ, আমাদের সবুজ-সুন্দর দেশটি হয়ে উঠবে সত্যিকারের সোনার দেশ।

সোনার মানুষ ছাড়া কি সোনালি দেশের স্বপ্ন দেখা যায়?

যায় না। তাই তো নিজেদের ভালোর জন্য, দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য আমাদেরকে রাসূলের (সা) আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে এই দেশকে মুক্ত করতে হবে। এটা কারা করবে?

আমরাই।

এসো, কারোর জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই শুরু করে দিই নিরক্ষরতা দূরীকরণের মহৎ কাজটি। প্রথমে পরিবারের কাজের লোক থেকে শুরু করা যায়। তারপর প্রতিবেশী মহল্লা, গ্রাম এবং অন্যত্র- সকল জায়গায়। সকল খানে।

কেন পারবো না?

রাসূল (সা) পেরেছেন। তিনিই তো পথ দেখিয়ে গেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম (সা) পেরেছেন।

পরবর্তীতে তারই ধারাবাহিকতায় ও আদর্শে পেরেছেন পৃথিবীর বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি।

যারা পেরেছেন- তাঁরা মহৎ হতে পেরেছেন। বড় হতে পেরেছেন। সুতরাং আমরা কেন পারবো না! ইনশাআল্লাহ পারবো।

এসো, হাতে হাত ধরে রাসূলের (সা) পথ অনুসরণ করে কঠিন প্রত্যয়ে গন্তব্য ঠিক করে নিই। তারপর দৃঢ়তার সাথে, সাহসের সাথে পা বাড়াই। এগিয়ে চলি সামনের দিকে।

আলোর দিকে। কল্যাণের দিকে। ক্রমাগত।.....

পিপাসায় কাঁদে দরিয়া

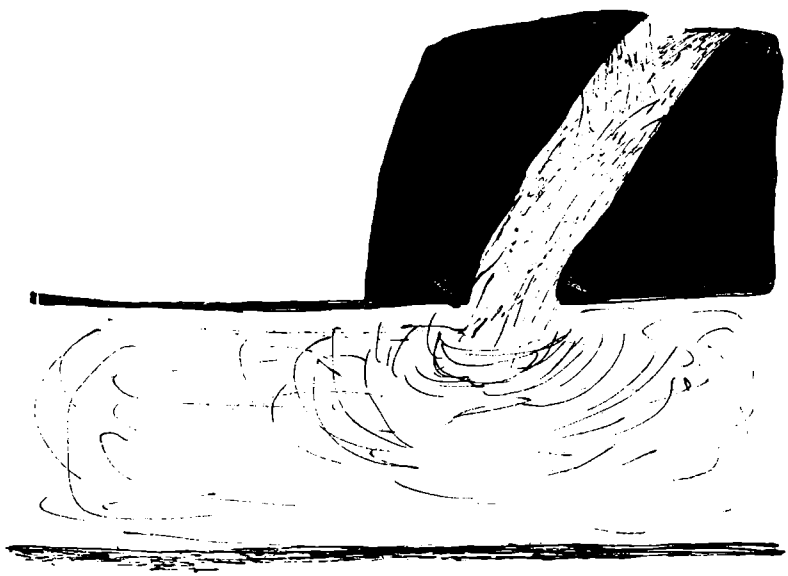

সময়টা দারুণ অস্থির!

মক্কার আকাশ-বাতাস মথিত করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে বর্বর কুরাইশদের ঢেড়া পেটানোর শব্দ।

কিসের ঢেড়া!

কিসের শব্দ!

মক্কার সবাই কান পেতে আছে।

সবাই শঙ্কিত।

তাদের কানে প্রবেশ করলো গরম সীসার মত একটি মর্মান্তিক ধ্বনি।

www.pathagar.com

ঢেড়া পিটিয়ে কে যেন বলছে, 'এসো, যদি দেখতে চাও তবে বেরিয়ে এসো। খুবাইবকে বন্দী করা হয়েছে। সবার সামনে তার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ কেটে তারপর হত্যা করা হবে শূলে চড়িয়ে। এই মজার দৃশ্য যারা দেখতে চাও তারা দ্রুত চলে এসো।'

কী বেদনার কথা!

কী নির্মম নিষ্ঠুরতা!

একজন সাহাবীকে বন্দী করে নরপশুরা এমনি উল্লাসে মেতে উঠেছে।

দুরু দুরু বুকে অনেকেই হাজির হলো।

তাদের মধ্যেই ছিলেন এক টগবগে তরুণ। নাম তার সাঈদ ইবন আমের।

তিনিও জনতার ফাঁক দিয়ে দেখছেন খুবাইবের ওপর নেমে আসা কঠিন এবং ভয়ঙ্কর নির্যাতন!

শুধু দেখছেনই না। শুনছেও বটে।

শুনছেন খুবাইবের দৃপ্তকণ্ঠ।

শুনছেন একজন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির ঈমানের সাহসী উচ্চারণ।

খুবাইবকে শূলে চড়ানোর জন্য সব কিছু প্রস্তুত।

এখন কেবল তাকে লটকানোর কাজ বাকি। এ সময়ে সাঈদের কানে ভেসে এলো এক প্রকার উচ্চারণ। কুবাইব জালিমদেরকে বলছেন,

'যদি অনুমতি দাও, তাহলে শূলে চড়বার আগে আমি দু' রাকায়াত নামাজ আদায় করতে পারি।'

বিস্মিত হলেন সাঈদ। এটা কী করে সম্ভব? মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কি এভাবে স্থির ও শান্ত থাকতে পারে কেউ!

তারা ভাবলো, মাত্র তো দু'রাকায়াত নামাজ! সুতরাং শেষ ইচ্ছা পূরণে তারা রাজি হয়ে গেল।

www.pathagar.com

খুবাইব গভীর মনোযোগের সাথে নামাজে দাঁড়ালেন।

তার মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই। নেই ভয়, শঙ্কা বা উৎকণ্ঠার বুদবুদ।

তিনি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন।

তারপর প্রশান্ত এবং কোমল হৃদয়ে আদায় করলেন প্রতিটি রুকু ও সিজদা। নামাজ শেষে সালাম ফিরিয়ে বর্বর কুরাইশদের দিকে ফিরলেন।

আহ কী নিষ্পাপ এবং সাহসী একটি মুখ!

কী তার ঈমানের তেজ!

তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন,

'আল্লাহর কসম! তোমরা যদি মনে না করতে যে, মৃত্যুর ভয়ে আমি নামাজ দীর্ঘ করছি, তাহলে আমি নামাজ আরও দীর্ঘ করতাম।'

সাঈদ শুনলেন খুবাইবের এই সাহসী নিষ্কম্প উচ্চারণ। তিনি আরও অবাক হলেন।

কিন্তু তার চেয়েও বেশি হতবাক হলেন, শিউরে উঠলেন কুরাইশদের নিষ্ঠুরতা দেখে। তিনি দেখলেন এই তেজোদীপ্ত খুবাইবের শরীর থেকে একের পর এক কেটে নিচ্ছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো! আর স্থির পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন খুবাইব!

তারা কাটছে আর কৌতূহল মিশিয়ে জিজ্ঞেস করছে,

'কি হে! তোমার জায়গায় মুহাম্মাদকে আনা হোক, আর তুমি মুক্তি পেয়ে যাও- এটা কি তুমি পছন্দ কর না?'

খুবাইবের দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে বেয়ে চলেছে রক্তের ধারা।

যেন শত ফুয়ারা।

একই সাথে প্রবাহিত হচ্ছে।

তখনো, তখনো শান্ত এবং স্থির খুবাইব।

বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

'আল্লাহর কসম!

আমি আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে নিরাপদে বাস করি, আর বিনিময়ে নবী মুহাম্মাদের (সা) গায়ে কাঁটার একটি আঁচড়ও লাগুক- তাও আমার পছন্দ নয়। আমি এরকম মুক্তি বা জীবন কিছুই চাইনে। সেটা আমার আদৌ কাম্য নয়।'

সাঈদ শুনলেন এবং দেখলেন। খুবাইবের এই জবাবের পর ভিড় করা জালিমদের দোসররা চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো ঃ

'হত্যা কর। ওকে হত্যা কর।'.....

সাঈদ ক্রুদ্ধ জনতার দিকে তাকালেন। তারপর খুবাইবের দিকে।

খুবাইব শূলি কাষ্ঠের ওপর দিয়ে নিঃসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

'হে আমার পরওয়ার দিগার, আল্লাহ! তাদের সংখ্যা তুমি গুণে রাখো। তাদেরকে তুমি এক এক করে হত্যা করো এবং কাউকেই তুমি ছেড়ে দিও না।'

সাঈদ শুনলেন খুবাইবের শেষ মুনাজাতের বাণী।

শুনলেন ঈমানের তেজে বলীয়ান একজন সাহসী মুজাহিদের কথা।

তারা দেখলেন, কিভাবে পাপিষ্ঠ জালিমরা তরবারি ও বর্ষার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও জর্জরিত করলো একজন মুমিনের পবিত্র দেহ!

শহীদ হলেন খুবাইব।

সাঈদের সামনেই।

সাঈদ ফিরে এলেন আপন গৃহে।

কিন্তু কোথায় সেই প্রশান্তি?

কোথায় সেই আরাম?

www.pathagar.com

ঐ বীভৎস, হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখার পর থেকেই সাঈদের মন থেকে দূরে গেল সকল প্রকার আনন্দ-উল্লাস।

হারিয়ে গেল মুখ আর প্রশান্তির নিঃশ্বাস।

তিনি ঘুমের মধ্যে, জাগরণে- সকল সময়ে তিনি অনুভব করতেন খুবাইবের সেই রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত দেহের উপস্থিতি। সেই চাহনি, সেই সাহসী উচ্চারণ আর সেই শেষ মুনাজাত।

যখনই তার মনে পড়তো খুবাইবের শেষ মুনাজাতের কথা, তখনই তিনি ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতেন। না জানি তার ওপরও আল্লাহর গজব নেমে আসে! ভয় হতো, না জানি এখনই তার ওপর নেমে আসবে বজ্রপাত কিংবা আকাশ থেকে বর্ষিত হবে কোনো পাথর বৃষ্টি!

ঘুমের বিছানায়, খাবার থালায়, পানির গেলাসে- সর্বত্রই তিনি দেখতে পেতেন শহীদ খুবাইবের অস্তিত্ব। যতই দেখতেন, ততই তিনি ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। আবার খুবাইবের সাহস ও ঈমানের শক্তিতে তিনি উজ্জীবিত হয়ে উঠতেন। ভাবতেন, কেবলই ভাবতেন- এখন তার কী করা উচিত!

ভাবতে ভাবতেই তিনি এক সময় খুঁজে পেলেন প্রশান্তির উপত্যকা।

তার সামনে তখন শূলে বিদ্ধ হবার পূর্ব মুহূর্তে সেই নামাজরত খুবাইবের আলোকিত চেহারা। তার সেই সাহস আর ঈমানের উজ্জ্বলতা। আর তার চারপাশে পরিব্যপ্ত নবী মুহাম্মাদের (সা) সেই ভুবন আলো করা এক সুদীপ্ত আহ্বান।–

এসো আলোর পথে।

এসো আল্লাহর পথে।

এসো ইসলামের পথে।

এসো নবীর (সা) পথে।

তবে আর কিসের প্রতীক্ষা!

কিসের দেরি!

www.pathagar.com

দেরি নয়। সাঈদের হৃদয়টি ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন মহান বারিতায়ালা। আর সাথে সাথেই সাঈদ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কুরাইশদের সামনে, তাদের দেব- দেবীর অসংখ্য মূর্তির সাথে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন দৃপ্তকণ্ঠে।

গোপনে নয়, প্রকাশ্যে।

ভয়ে ভয়ে নয়, অসীম সাহসের সাথে।

এবং তারপর।–

তারপর থেকেই বদলে গেল সাঈদের জীবনধারা। তিনি মক্কা ছেড়ে হিজরত করে চলে এলেন মদীনায়।

সেখানে রয়েছেন দয়ার নবীজী (সা)।

তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে জুড়িয়ে নিলেন তার তাপিত ও পিপাসিত হৃদয়।

অত্যন্ত আপন করে নিলেন রাসূলকে (সা)। একেবারে নিজের করে।

সকল সময় ছায়ার মতো থাকতেন রাসূলের (সা) সাথে।

নবীজীর সার্বক্ষণিক সাহচর্যের মাধ্যমে নিজেকে সকল দিক থেকেই যোগ্য করে গড়ে তোলেন সাঈদ।

সেটা ছিল খাইবার যুদ্ধের আগের কথা। এরপর তার জীবদ্দশায় খাইবারসহ যত যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে, সাঈদ প্রতিটি যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছেন অত্যন্ত সাহসের সাথে।

এরপরের ইতিহাস- সে তো কেবল, সাঈদের ঈমান, সাহস, ত্যাগ ও কুরবানির ইতিহাস।

সে তো কেবল আল্লাহর রাস্তায় একজন মুমিনের জীবন অকাতরে বিলিয়ে দেবার ইতিহাস।

সে তো দুনিয়াবিমুখ কেবল জান্নাতমুখী এক সফেদ সম্পানের ইতিহাস।

সাঈদের মতো এমনি সফল জীবন গড়তে কার না ইচ্ছা হয়।

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষে আপনজন

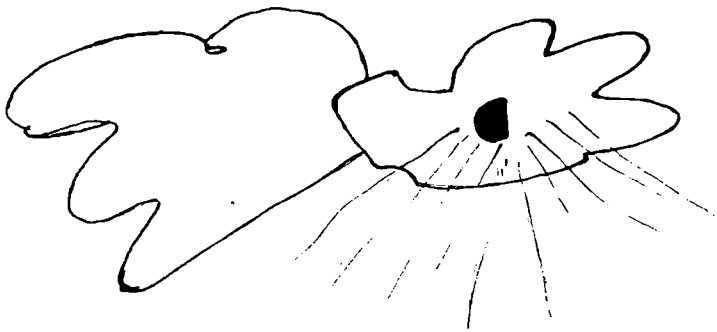

মেঘ কেটে সূর্যের আলোকচ্ছটা কেবল ছড়াতে শুরু করেছে চারদিকে।

সে কি গুঞ্জরণ! পাখির কলরব! বাতাসেও ভেসে যাচ্ছে প্রশান্তির সুসংবাদ!

সেই এক সময় বটে!

প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা)।

কী এক সৌভাগ্যবান আলোকিত নক্ষত্র!

তিনি ইসলাম গ্রহণের পরপরই ইসলাম গ্রহণ করলেন তাঁর পরিবারের আর সকলে। কেবল একজন ছাড়া।

তাঁরই পুত্র। আবদুল রহমান।

একদিকে আলোর মিছিল। অন্যদিকে আঁধারের ছায়া। ঠিক যেন দিন আর রাত। তাও একই পরিবারে।

www.pathagar.com

ভাগ্যবিড়ম্বিত আবদুর রহমান!

যখন দিনে সূর্যের আলো আর রাতের জোছনার হাট বসেছে তার পরিবারে, তখনও তিনি আলোহীন এক অন্ধকূপের নিচে পড়ে কেবলই হাবুডুবু খাচ্ছেন।

তার হৃদয়ে তখনো প্রবেশ করেনি ইসলামের দ্যুতি।

ঈমানের ফুলকি।

তখনো তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন মিথ্যার কুহকে, জাহেলিয়াতের এক পর্বত থেকে আর এক পর্বতে।

ছুটে বেড়াচ্ছেন বিভ্রান্তির উপত্যকায়।

বদনসীব আর কাকে বলে!

বদর প্রান্তর!

যুদ্ধ চলছে তীব্রগতিতে। মুশরিক এবং মুমিনদের মধ্যে যুদ্ধ।

সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে যুদ্ধ।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন স্বয়ং রাসূল (সা)। সাথে আছেন খুব কাছের আপনজন, একান্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাহাবী হজরত আবু বকর (রা)।

সেই সাথে আছেন একদল বিশ্বাসী জানবাজ মুজাহিদ।

তাঁরা আছেন সত্যের পক্ষে।

তাঁরা আছেন আল্লাহর পক্ষে।

তাঁরা আছেন ইসলামের পক্ষে।

আছেন প্রানপ্রিয় নবী মুহাম্মাদের (সা) পক্ষে। তাঁদের আর কীসের ভয়?

একমাত্র শহীদ হওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে তাঁদের আর কোনো স্বপ্ন নেই। নেই অন্য কোনো পিপাসা বা লালসা।

কেন থাকবে?

এতদিনে তাঁরা তো জেনে গেছেন সত্যের পথে শহীদ হওয়ার মর্যাদা ও গৌরবের কথা।

www.pathagar.com

জেনে গেছেন শহীদের কী পুরস্কার!

আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই বিরল সম্মান আর পুরস্কার লাভের এইতো শ্রেষ্ঠ সময়। ভাবেন সত্যের পথের মুজাহিদরা।

তাঁরা আরও দ্বিগুণ সাহসের সাথে, তার চেয়েও বেশি উৎসাহ আর উদ্দীপনার সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন।

থেমে নেই সত্যের দুশমন- মুশরিকরাও। তারাও তাদের পার্থিব সুখ-সম্ভোগ, জাগতিক স্বপ্ন-সাধ আর এক কী নিদারুণ মিথ্যা অহমিকায় অন্ধ হয়ে লড়ে যাচ্ছে মুসলিম সৈনিকদের সাথে।

লড়ছে। তবুও তাদের বুক দুরু দুরু।

কাঁপছে তাদের পা এবং বাহু।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

মিথ্যার কোনো শক্তি নেই।

সাহস নেই।

নেই সামনে বাড়ানোর মতো কোনো তেজ। মিথ্যার শক্তি বা দাপট খুবই সাময়িক।

তার চেয়েও ক্ষণস্থায়ী।

কিন্তু তখনো পর্যন্ত সত্য-মিথ্যার এই ফারাকটা বুঝে উঠতে পারেননি আবদুর রহমান। আর পারেননি বলেই তিনিও মুশরিকদের সাথে, মক্কার কুরাইশদের পক্ষে বদরে এসেছেন যুদ্ধ করতে।

তার প্রতিপক্ষে রয়েছেন- স্বয়ং রাসূল (সা)।

রয়েছেন তারই পিতা হজরত আবু বকর (রা)।

বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে!

পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছেন পুত্র!

পুত্রের বিরুদ্ধে পিতা!

পিতা-পুত্র এখানে বড় কথা নয়, বড় কথা হলো সত্য আর মিথ্যা।

www.pathagar.com

হক আর বাতিল।

যেখানে সত্য আর মিথ্যার লড়াই, সেখানে পিতা-পুত্রের মতো সম্পর্কও অতি তুচ্ছ বিষয় হয়ে যায়।

বদর প্রান্তর ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে।

যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা তখনো নির্ধারিত হয়নি।

ঠিক এমনি মাঝামাঝি সময়ে আবদুর রহমান যুদ্ধের ময়দান থেকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন দুঃসাহসী আছে, এসো! এসো আমার সাথে লড়তে!

পুত্র আবদুর রহমানের এই চ্যালেঞ্জের ধ্বনি ঠিক বজ্রের মতো আঘাত হানলো পিতা আবু বকরের (রা) কানে

তিনি শুনলেন পুত্রের স্পর্ধার কথা।

শুনলেন এবং মর্মাহত হলেন।

ভাবলেন, এই কি আমার পুত্র!

ভাবতেই তাঁর শরীর কেঁপে উঠলো রাগে এবং ক্ষোভে।

তাঁর দু'টো চোখ দিয়ে তখন কেবলই বেরিয়ে আসছে ক্রোধ এবং ঘৃণার আগুন।

ভাবলেন, ওর এত বড় সাহস? সাথে সাথেই আবু বকর (রা) পুত্রের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি লড়বেন।

লড়বেন তারই পুত্র আবদুর রহমানের সাথে। তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করতেই রাসূল (সা) তাঁকে নিষেধ করলেন। নিষেধ করলেন পুত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে।

রাসূলের (সা) নির্দেশ বলে কথা।

মহান সেনাপতির আদেশ অমান্য করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। ফলে পুত্রের সাথে আর যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারলেন না হজরত আবু বকর (রা)।

www.pathagar.com

বদর গেল।

এলো উহুদের যুদ্ধ।

এবারও আবদুর রহমান মক্কার কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধ করছেন।

তার প্রতিপক্ষে রয়েছেন আবারও রাসূল (সা)। সাথে আছেন তাঁর সাহসী মুজাহিদবৃন্দ, আর আছেন পিতা আবু বকর (রা)।

উহুদের যুদ্ধে আবদুর রহমান ছিলেন কুরাইশদের তীরন্দাজ বাহিনীর অন্যতম সদস্য।

এই যুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করেছেন মিথ্যার পক্ষে আর সত্যের বিরুদ্ধে।

তখনো তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ার নিচে দাঁড়াতে পারেননি।

অনেক পরে, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় এই আবদুর রহমানের ভেতর জেগে উঠলো সত্যের সূর্য। সেই আলোতে তার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল সত্য আর মিথ্যার তফাৎ। বুঝতে পারলেন, কী ভুলটাই না তিনি করেছেন এতদিন!

মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

আর সত্যের জয় নিশ্চিত।

হয়তো মাঝখানে কিছুটা সময়ের ব্যবধান। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান, যাদের বিবেক আছে, প্রজ্ঞা আছে, আছে সত্য-মিথ্যা বিচার ও বিবেচনা করার মতো মেধা- তারা ঠিকই একদিন সেই সত্যকে বুঝে উঠতে পারেন। কিন্তু যারা নাদান, মূর্খ- তারা অন্ধ অহমিকায় মিথ্যার অতল সাগরে কেবলই সাঁতরে চলে। আর এভাবেই এক সময় ক্লান্ত, বড্ডো ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে ঢলে পড়ে মৃত্যুর গুহায়।

এদের ভাগ্যে দুনিয়ায় যেমন গ্লানি আর লাঞ্ছনা জোটে, আখেরাতেও রয়েছে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক শাস্তি।

www.pathagar.com

তবুও ভাল, সেই সকল দুর্ভাগাদের কাতার থেকে আবদুর রহমান শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে শামিল হয়েছিলেন পরম নির্ভরতার স্থল-ইসলামের ছায়াতলে। আশ্রয় নিয়েছিলেন অবস্থিত অসংখ্য বিশ্বাসী ও সাহসীদের মাঝে।

আবদুর রহমানও ছিলেন অত্যন্ত সাহসী।

তিনি ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দাজ। ইসলাম গ্রহণের পর তার সাহসের মাত্রা আরো বেড়ে গেল বহুগুণে।

কারণ আগে যুদ্ধের সময় সামনে কোনো লক্ষ্য বস্তুত থাকতো না। আর এখন যুদ্ধের সময় তার সামনে থাকে বিজয় কিংবা শাহাদাত।

সুতরাং কোনো পরওয়া নেই তার।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর থেকে রাসূলের (সা) জীবিত কালে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, প্রতিটি যুদ্ধেই আবদুর রহমান অংশ নিয়েছিলেন।

অসীম সাহস আর বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। খাইবার অভিযানে তিনি রাসূলের (সা) সাথে। রাসূলের (সা) ইন্তিকালের পর, আরব উপদ্বীপের চারদিকে যখন দেখা দিল চরম বিদ্রোহ, তখন এই আবদুর রহমানই সেই বিদ্রোহ দমনে পালন করেন অসামান্য ভূমিকা।

ভণ্ড নবী মুসাইলামা আল কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি পরিচয় দেন অত্যন্ত বীরত্বের।

এই যুদ্ধে তিনি একাই শত্রুপক্ষের সাতজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকে হত্যা করেন। ইয়ামামার শত্রুপক্ষের দুর্গের একস্থানে ফাটল দেখা দিল। সেই ছোট্ট পথটি দিয়ে মুসলিম মুজাহিদরা দুর্গের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছেন বারবার। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছেন। কারণ দুর্গের সেই ছোট্ট পাথটি আগলে রেখেছে কাজ্জাবের বাহিনীর এক দুঃসাহসী সৈনিক-মাহকাম ইবনে তুফাইল।

www.pathagar.com

দৃশ্যটি দেখলেন আবদুর রহমান।

দেখার সাথে সাথেই তিনি মাহকামের বুকের সিনা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন।

ব্যাস্! মুহূর্তেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর মুসলিম মুজাহিদরা মাহকামের সঙ্গীদের পায়ে পিষতে পিষতে প্রবেশ করলেন ভেতরে।

তারপর খুলে দিলেন দুর্গের দরোজা।

দুর্গের পতন হলো।

সেই সাথে বিজয় হলো সত্যের।

বিজয় হলো ঈমানের

হযরত আবদুর রহমান।

সত্য ও সাহসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র!

তিনি মিথ্যার দুর্গ ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে, সকল আঁধার পায়ে দলে নিজের জন্য খুলে দিয়েছিলেন চিরসত্য ও সুন্দরের দরোজা। যার মধ্যে ছিল কেবল আলো আর আলোর খেলা

শান্তি আর শান্তি স্রোতধারা।

পার্থিব জীবনের সুখ-শান্তিই বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হলো আল্লাহকে খুশি করা।

রাসূলকে (সা) আপন করে নেয়া।

ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিজেকে সমর্পণ করা।

এখানেই প্রকৃত শান্তি, মুক্তি এবং কল্যাণের বৃষ্টিধারা ঝরঝর করে ঝরে।

এমন চিরস্থায়ী সুখের জন্য কার না লোভ হয়!

www.pathagar.com

সাহসের নিত্য সহচর

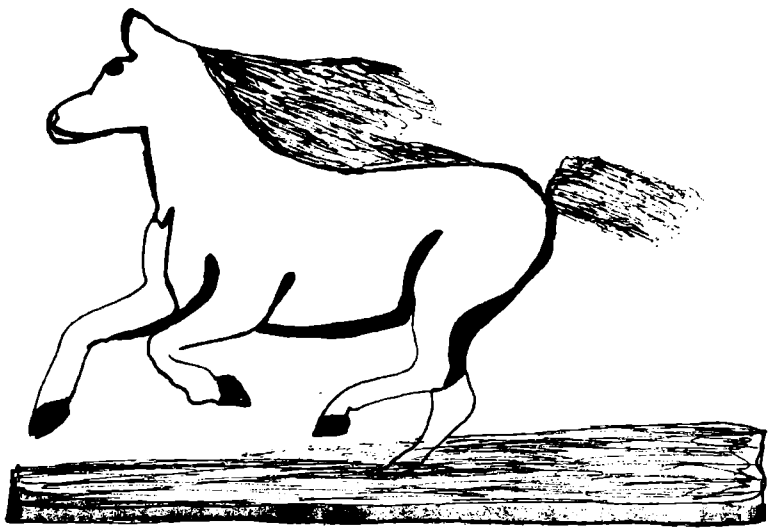

খুব কম বয়স।

একেবারেই কিশোর।

কিন্তু শরীরে যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি শক্তি।

তাজি ঘোড়ার মত টগবগ করে ছুটে বেড়ান তিনি। কাউকে পরওয়া করেন না।

সাহসের তেজ ঠিকরে বের হয়ে আসে তার দেহ থেকে। সমবয়সী তো দূরে থাক, অনেক বড় পাহলোয়ানও হার মানে তার সাথে মল্লযুদ্ধে।

সে এক অবাক করার মত দুঃসাহসী শক্তিশালী কিশোর!

www.pathagar.com

নাম যুবাইর ইবনুল আওয়াম।

রাসূলের (সা) দাওয়াতে তখন মুখরিত চারদিক।

নবীজীর ডাকে সাড়া দিতে দলে দলে লোক ছুটে আসছে তাঁর কাফেলার কাতারে।

পুরো মক্কায় তখন ইসলামের দাওয়াতী আওয়াজ।

ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে তার মৌ মৌ গন্ধ।

শান্তির সৌরভে ক্রমশ ভরে উঠছে বিশ্বাসীদের হৃদয়ের চাতাল।

যুবাইরও দেখছেন। দেখছেন আর শুনছে ফিসফিস মধুর গুঞ্জন।

তারও কানে বেজে উঠছে রাসূলের (সা) কণ্ঠনি:সৃত সেই মধুর এবং শাশ্বত শিক্ষা।

এসো আলো পথে।

এসো সুন্দরের পথে।

এসো আল্লাহর পথে।

এসো রাসূলের পথে।

যুবাইরের বয়স তখন মাত্র ষোল। বয়সে কিশোর। কিন্তু তার শরীরে বইছে যৌবনের জোয়ার। যে কোনো যুবকের চেয়েও তিনি অনেক বেশি সবল এবং সাহসী।

কানখাড়া করে যুবাইর শুনলেন রাসূলের (সা) আহ্বান। আর দেরি নয়। সাথে সাথে তিনি কবুল করলেন ইসলাম।

দয়ার নবীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এক পরম প্রশান্তির ছায়ায়। রাসূল ও তাকে স্থান দিলেন স্নেহের বাহুডোরে।

রাসূলের (সা) প্রতি যুবাইরের ভালোবাসা ছিল অপরিসীম।

সেই ভালোবাসার কোনো তুলনায় চলে না।

একবার কে যেন রটিয়ে ছিল, মুশরিকরা বন্দি অথবা হত্যা করেছে প্রাণপ্রিয় নবীকে।–

www.pathagar.com

একথা শুনার সাথে সাথেই বারুদের মত জ্বলে উঠলেন যুবাইর।

অসম্ভব!

অসম্ভব এ দুঃসাহস!

তিনি একটানে কোষমুক্ত করলেন তার তরবারি। তারপর যাবতীয় ভিড় ঠেলে, ঊর্ধশ্বাসে ছুটে গেলেন নবীজীর কাছে।

রাসূল তাকালেন যুবাইরের দিকে। তিনি বুঝে গেলেন যুবাইরের হৃদয়ের ভাষা। তিনি হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে যুবাইর?

যুবাইরের ভেতর তখনও বয়ে যাচ্ছে ক্রোধের কম্পন। তিনি বললেন,

হে রাসূল! খবর পেলাম, আপনি বন্দি অথবা নিহত হয়েছেন!

রাসূল খুশি হলেন যুবাইরের আত্মত্যাগ আর ভালোবাসার নজির দেখে। তিনি দোয়া করলেন খুশি হয়ে তার জন্য।

এটাই ছিল প্রথম তরবারি, যা জীবন উৎসর্গের জন্য প্রথম একজন কিশোর কোষমুক্ত করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের কারণে যুবাইরের ওপরও নেমে এসেছিল অকথ্য নির্যাতন।

তার চাচা, যে চাচাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন প্রাণ দিয়ে, সেও মুহূর্তে শত্রু হয়ে গেল কেবল সত্য গ্রহণের কারণে।

পাপিষ্ঠ চাচা!

নিষ্ঠুর চাচা! হিংস্র পশুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

গরম, উত্তপ্ত পাথর! যে পাথরের ওপর ধান ছিটিয়ে দিলেও খই হয়ে যায়। এমন গরম পাথরের ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিত ভাতিজা যুবাইরকে। আর বলতো ইসলাম ত্যাগ করার জন্য।

কিন্তু একবার যে পেয়ে গেছে সত্যের পরশ, সে কি আর বিভ্রান্ত হতে পারে কোনো অত্যাচার আর নির্যাতনে?

না! যুবাইরও চুল পরিমাণ সরে আসেননি তার বিশ্বাস থেকে।

তার সত্য থেকে।

বরং নির্যাতন যত বেড়ে যেত, ততোই বেড়ে যেত তার আত্মবিশ্বাস আর সাহসের মাত্রা। তিনি কঠিন সময়েও পরীক্ষা দিতেন ঈমান আর ধৈর্যের।

তিনি ছিলেন হরিণের চেয়েও ক্ষিপ্রগতির আর বাঘের চেয়েও দুঃসাহসী!

বদর যুদ্ধে দেখা গেল সেদিন তিনি ছিলেন বিভীষিকার চেয়েও ভয়ানক!

সেদিন মুশরিকদের সুদৃঢ় প্রতিরোধ প্রাচীর ভেঙে তছনছ করে দেন তিনি।

একজন মুশরিক সৈনিক কৌশলে উঠে গেছে একটি টিলার ওপর।

সেখান থেকে সেই ধূর্ত চিৎকার করে যুবাইরকে আহ্বান জানালো দ্বন্দ্ব যুদ্ধের। ইচ্ছা ছিল যুবাইরকে পরাস্ত করা।

তার আহ্বানে সাড়া দিলেন যুবাইর।

উঠে গেলেন টিলার ওপর।

তারপর তাকে জাপটে ধরলেন আচ্ছা করে। দু'জনই টিলা থেকে গড়িয়ে পড়ছেন নিচে।

রাসূল দেখছেন সবই।

বললেন, এদের মধ্যে যে প্রথম ভূমিতে পড়বে, নিহত হবে সেই।

কী আশ্চর্য!

রাসূলের কথা শেষ হতেই ভূমিতে প্রথম পড়লো সেই মুশরিকটি। আর সাথে সাথেই তরবারিটির একটি মাত্র আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেললেন যুবাইর। এবার মুখোমুখি হলেন আর একজন- উবাইদা ইবন সাঈদের। সে এমনভাবে বর্মাচ্ছাদিত ছিল যে তার চোখ দু'টো ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

www.pathagar.com

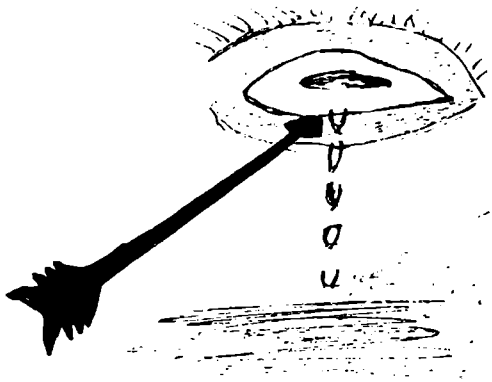

কুশলী এবং সতর্ক যুবাইর। তিনি উবাইদার চোখ নিশানা করে তীর ছুঁড়লেন।

অব্যর্থ নিশানা! বিদ্যুৎগতিতে তীরটি বিঁধে গেল উবাইদার চোখে। এফোঁড়- ওফোঁড় হয়ে তীরটি গেঁথে আছে তার চোখের ওপর।

যুবাইর ছুটে গেলেন উবাইদার কাছে। তারপর তার লাশের ওপর বসে তীরটি টেনে বের করে আনলেন।

কিছুটা বেঁকে গেছে। সেই বাঁকা তীরটি রাসূল (সা) নিয়ে রেখেছিলেন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।

রাসূলের ইন্তেকালের পর খলিফাদের কাছেও রক্ষিত ছিল এই ঐতিহাসিক তীরটি।

হযরত উসমানের শাহাদাতের পর নিজের কাছেই আবার তীরটি নিয়ে নেন যুবাইর!

বদর যুদ্ধে তিনি জীবনবাজি রেখে এমনভাবে যুদ্ধ করেছিলেন যে ভোতা হয়ে গিয়েছিল তার তরবারিটি।

তিনিও আহত হয়েছিলেন মারাত্মকভাবে।

www.pathagar.com

শরীরে একটি গর্ত হয়ে গিয়েছিল বিশাল। তার ছেলে উরওয়া বলতেন,

আমরা আব্বার শরীরের সেই গর্তে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।

বদর যুদ্ধে যুবাইয়ের মাথায় ছিল হলুদ পাগড়ি।

রাসূল (সা) হেসে বলেছিলেন, 'আজ ফেরেশতারাও এই বেশে এসেছে।'

উহুদ যুদ্ধ!

সত্য এবং মিথ্যার যুদ্ধ।

রাসূল কোষমুক্ত করলেন তার তরবারি।

তারপর বললেন, আজ কে এই তরবারির হক আদায় করতে পারবে?'

রাসূলের (সা) আহ্বানে সকল সাহাবীই অত্যন্ত আনন্দের সাথে চিৎকার করে বললেন,

আমি! আমিই পারবো এই তরবারির হক আদায় করতে।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন যুবাইর। তিনি তিন তিনবার বললেন,

হে রাসূল! আমাকে দিন। আমিই এই তরবারির হক আদায় করবো।

কিন্তু সেই সৌগাগ্য অর্জন করেন আর এক দুঃসাহসী সৈনিক- আবু দু'জানা।

খন্দকের যুদ্ধেও ছিল যুবাইয়ের অসাধারণ ভূমিকা।

যুদ্ধের সময় মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কোরাইজ ভঙ্গ করলো মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি। তাদের অবস্থান জানা দরকার রাসূলের (সা)। তাদের সম্পর্ক খোঁজ-খবর নেয়া জরুরি।

কিন্তু কাজটা ছিল না সহজ কিছু।

রাসূল (সা) তাকালেন তার সাহাবীদের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, কে পারবে তাঁদের থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আমাকে জানাতে?

তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন।

www.pathagar.com

আর তিনবারই হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন যুবাইর। বললেন,

`হে রাসূল! আমি, আমিই পারবো সেখানে যেতে এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে। দয়া করে আমাকে অনুমতি দিন হে রাহমাতুল্লিাল আলামিন!

যুবাইরের কথায় ভীষণ খুশি হলেন রাসূল। তিনি বললেন,

'প্রত্যেক নবীরই থাকে হাওয়ারি। আমার হাওয়ারি হলো- যুবাইর। হযরত যুবাইর!

তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) হাওয়ারি এবং নিত্য সহচর।

সাহস, সততা, আমানতদারী, দয়া, কোমলতা,- এ সবই ছিল তার আচ্ছাদিত পোশাকের মত অনিবার্য ভূষণ।

আল্লাহ, রাসূল (সা) এবং ইসলামের প্রতি ছিল তার দৃষ্টান্তমূলক ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ

সোনার মানুষ ছিলেন তিনি।

যে দশজন সাহাবীর বেহেশতের আগাম সুসংবাদ দিয়েছিলেন দয়ার নবীজী, যুবাইর ছিলেন তাদেরই একজন, অত্যতম।

হযরত যুবাই!

কী অসাধারণ তার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব!

এখনও যেন হাওয়ায় দুলছে তার সেই দুঃসাহসী মস্ককের হলুদ পাগড়ির দুর্বিনীত শিষ। আর জেগে আছেন আমাদের মাঝে সাহসের নিত্য সহচর ২য় হযরত যুবাইর!

তাকে ভোলা যায় কখনো?

www.pathagar.com

ঝরা পাতার বাহিনী

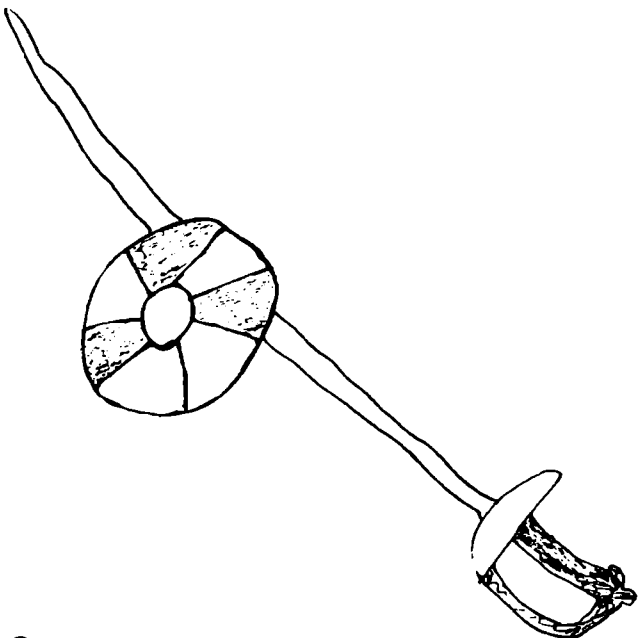

দুঃসাহসী এক নাম-কায়স!

পুরো নাম– কায়স ইবন সা'দ ইবন উবাদা। এই দুঃসাহসী সাহাবী ছিলেন রাসূলের (সা) পতাকাবাহীদের অন্যতম।

হিজরি অষ্টম সন। শুরু হতে যাচ্ছে 'জায়শুল খাবাত' যুদ্ধ! যুদ্ধটি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা!

রাসূল (সা) প্রস্তুতি নিতে বললেন যুদ্ধের জন্য। সাথে সাথে তিনশো মুজাহিদের এক বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

কাফেলার সাথে আছেন হজরত আবু বকর (রা) এবং হজরত উমরও (রা)।

www.pathagar.com

এবার যাত্রার পালা।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কাফেলাটি নিয়ে হজরত আবু উবাইদা সমুদ্র উপকূলের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে তাঁদের থাকতে হয় দীর্ঘ পনের দিন। এই পনের দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল তাঁদের আনা সকল খাদ্যদ্রব্য।

দেখা দিল প্রচণ্ড খাদ্যসঙ্কট।

এখন কি উপায়?

মুজাহিদগণ তবুও হতাশ কিংবা নিরাশ নন। তাঁরা ক্ষুধার জ্বালায় গাছের ঝরাপাতা খেতে থাকেন।

গাছের ঝরাপাতা খেয়ে তাঁরা জীবন ধারণ করেছিলেন বলেই এই যুদ্ধের নাম ইতিহাসে লেখা হয়ে গেল–

'ঝরা পাতার বাহিনী' বা 'জয়শুল খাবাত।' 'খাবাত' অর্থ ঝরা পাতা।

মুজাহিদদের এই তীব্র খাদ্যসঙ্কটকালে হজরত কায়স তিনটি করে উট ধার নিয়ে জবেহ করতেন প্রতিদিন। তিনবার মোট নয়টি উট তিনি এভাবে ধার নিয়ে জবেহ করেন।

আর তাই দিয়ে গোটা বাহিনীর ক্ষুধা মেটান। কায়সের এভাবে উট ধার করে জবেহ করা দেখে বাহিনীর সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ভাবেন, একি! এভাবে একাই এতগুলো করে উট ধার করে জবেহ করলে তো তার পিতা নিঃস্ব হয়ে পড়বে!

হজরত আবু বকর (রা) এবং উমর (রা)– দু'জনই তাকে উট জবেহ করা থেকে বিরত রাখার পরামর্শ দিলেন।

যুদ্ধ শেষে ফিরে এলেন 'ঝরাপাতার বাহিনী'। ফিরেই রাসূলকে (সা) তারা জানালেন কায়সের কথা।

তিনি কিভাবে প্রতিদিন কতগুলো করে উট জবেহ করেছেন!

www.pathagar.com

শুনে তিনি বললেন–

'দানশীলতা অবশ্যই এই বাড়ির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শুধু দানশীলতা কেন, সাহসও ছিল তার অন্যতম ভূষণ।

তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) পতাকাবাহীদেরও অন্যতম। সুতরাং এতেই বুঝা যায় তিনি কেমন সাহসী ছিলেন।

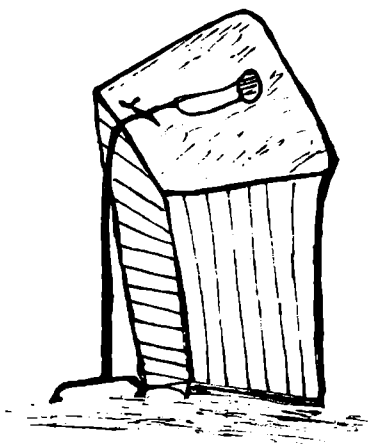

রাসূলের (সা) ওফাতের পর কায়স (রা) যুদ্ধের সময়ে প্রায়ই আবৃত্তি করতেন একটি কবিতার কিছু চরণ–

"এ সেই ঝাণ্ডা যা আমার নবীর সাথে বহন করেছি।

তখন জিবরাইল ছিলেন আমাদের সাহায্যকারী।

আমরা সেই জাতি–

যখন তারা যুদ্ধ করে

তখন দেশ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত

তাদের তরবারি ধরা হাতটি প্রলম্বিত হতে থাকে।"

www.pathagar.com

রাসূলের (সা) একবারে কাছাকাছি থাকার কারণেই কায়সের (রা) চরিত্রেও পড়েছিল সেই আলোকের ছায়া।

জোছনার দীপ্তি।

যার মধ্যে ছিল পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অনীহা।

তাকওয়া।

দানশীলতা।

চিন্তা ও অধ্যবসায়।

উদারতা।

বীরত্ব।

সকলকে সমানভাবে ভালোবাসা।

এবং সাহসিকতা।

মূলত সাহস এবং বিশ্বাস ছাড়া একজন মুমিন-মুজাহিদের জন্য আর কোন বড় সম্পদ আছে! কায়স (রা) তো এখনো আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন।

তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও গুণাবলির জন্য।

এমনি কায়স– হ্যাঁ, এমনি লক্ষ কায়সের আজ বড় বেশি প্রয়োজন।

আমরাও কি হতে পারি না! হতে পারি না ঝরাপাতার বাহিনীর সেই দুঃসাহসী কায়সের মতো?

নিশ্চয়ই পারি। প্রয়োজন শুধু রাসূলের (সা) আলোকরশ্মিতে নিজেকে আলোকিত করে তোলার।

এসো আমরা প্রত্যেকেই তেমনি ঈমানের বলে বলীয়ান একেকজন দুঃসাহসী সত্যের সৈনিক হয়ে উঠি।

www.pathagar.com

ভালোবাসায় ভেজা ভোর

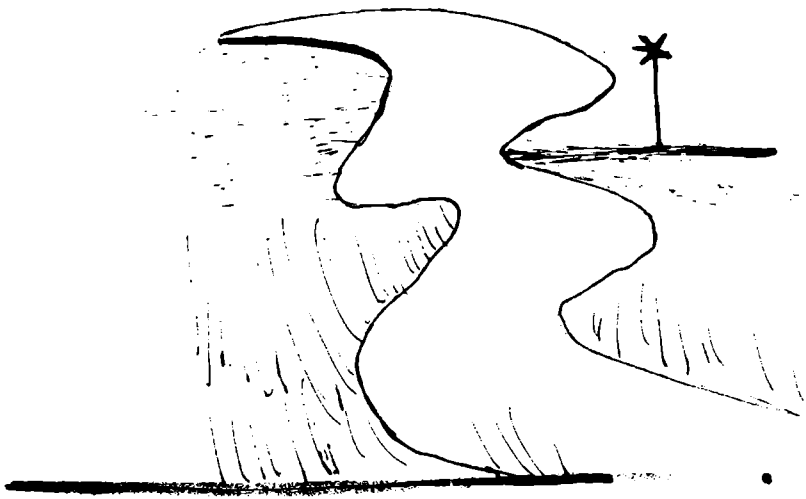

মসজিদে জাবিয়া।

একান্তে বসে কথা বলছেন আলোর পাখিরা।

কথা বলছেন-ইবন গানাম, আবু দদারদা এবং উবাদা ইবন সামিত।

তারা কথা বলছেন 'আল্লাহর দীন নিয়ে। ইসলাম নিয়ে। কথা বলছেন প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মদকে [সা] নিয়ে। আরও কত প্রসঙ্গে!

তারা কথা বলছেন আর একে অপরের দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। তাদের দৃষ্টিতে জড়িয়ে আছে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ আর বন্ধুসুলভ- বৃষ্টিধোয়া জোছনার পেলব।

তারা মগ্ন হলেন একে অপরের প্রতি। নিজেদের কথার প্রতি।

গভীর মনোযোগের সাথে তারা শুনছের পরস্পরের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

www.pathagar.com

এমনি সময়–

ঠিক এমনি সময় তাদের মনোযোগ ভেদ করে সেখানে উপস্থিত হলেন আর এক বেহেশতী আবাবিল–হযরত শাদ্দাদ।

শাদ্দাদ উপস্থিত!

সুতরাং সবার দৃষ্টি এখন তার দিকে। কারণ তিনিও যে তাদের ভাই! একান্ত আপনজন। সহদর ভাইয়ের চেয়েও অনেক কাছের।

কেন নয়?

সবাই যে রাসুলের [সা] একই স্নেহের ছায়ায় লালিত! যে রাসূলকে [সা] তারা ভালবাসেন প্রাণের চেয়েও অনেক বেশি।

শাদ্দাত এসেছেন!

তার দিকেই সবার দৃষ্টি। সম্ভবত তিনি কিছু বলবেন। সবাই মনোযোগী হলেন তার দিকে।

শাদ্দাদ এবার গম্ভীর হলেন।

চোখে মুখে কী যেন এক ভয়ের রেখা দুলে উঠলো।

কী যেন এক শংকা!

সেকি শংকা, না কি উদ্বেগ!

ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। প্রায় ক্লান্তকণ্ঠে শাদ্দাদ বললেন:

হে প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ!

আপনাদের নিয়ে আমার ভয় হচ্ছে। দারুন ভয়!

কী সেই ভয়!

জিজ্ঞেসে করলেন তারা।

শাদ্দাদ বললেন, সেই ভয়টা হলো: রাসূল [সা] তো বলেছেন, আমার উম্মত প্রবৃত্তি বা ইচ্ছার অনুসারী হয়ে পড়বে। এবং তারা লিপ্ত হবে শিরকে!

চমকে উঠলেন আবুদ দারদা এবং উবাদা।

বলেন কী আমরা তো শুনেছি রাসূলের [সা] একটি হাদীস :

www.pathagar.com

'আরব উপদ্বীপের শয়তান তার উপাসনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে।'

তাহলে বলুন, ভাই শাদ্দাদ– মুশরিক হওয়ার অর্থ কী? কী বুঝাতে চাইছেন আপনার ঐ বেদনা-বিধুর বাক্য দিয়ে?

শাদ্দাদ বললেন, ধরুন কোনো ব্যাক্ত নামায পড়ে লোক দেখানোর জন্যে। এবং যাকাতও আদায় করে লোক দেখানোর জন্যে। এবার বলুন, ঐ লোকটি সম্পর্কে আপনাদের ধারণাটি কী?

আবু দারদা এবং উবাদা জবাব দিলেন, সে নিশ্চয়ই মুশরিক!

শাদ্দাদ বললেন, ঠিক বলেছেন। আমি রাসূলের [সা] কাছে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যারা লোক দেখানোর জন্যে এসব কাজ করবে, তারা হবে মুশরিক।

এখানে উপস্থিত ছিলেন আউফ ইবন মালিকও।

তিনি বললেন, যতটুকুই কাজ লোক দেখানো থেকে মুক্ত হবে, ততোটুকুই কবুল হওয়ার আশা আছে আল্লাহর কাছে। আর বাকী কাজ, যাতে শিরকের মিশ্রণ আছে, তা কখনো কবুল হবে না। এই হিসাবে আমাদের কাজের ওপর আস্থাবান হওয়া উচিত।

তার কথা শুনে শাদ্দাদ বললেন, রাসূল [সা] বলেছেন, মুশরিকের যাবতীয় আমল তার মাবুদকে দেয়া হবে। আল্লাহ তার মুখাপেক্ষী নন।

পবিত্র আল কুরআনেও রয়েছে এমনি কথা। আল-কুরআন বলছে: 'আল্লাহ পাক কোন অবস্থাতেই শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না।'

হযরত শাদ্দাদ।

হাদীসের ব্যাপারে তার ছিল দারুন পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন খাঁটি অনুসারী। ছিলেন দীনের ব্যাপারে আপোষহীন। আর ছিলেন ইবাদতের প্রতি অসীম মনোযোগী। আল্লাহর ভয়ে তিনি সবসময় থাকতেন কম্পমান। ইবাদত সেরে হয়তোবা শুয়ে পড়েছেন শাদ্দাদ। গভীর রাত। কিন্তু না, ঘুম আসছে না তার চোখে। কেবলই ভাবছেন আখেরাতের কথা।

ব্যাস!

কোথায় আর ঘুম কিংবা শোয়া!

www.pathagar.com

তিনি উঠে পড়লেন। উঠে পড়লেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন আবারও নামাযে। মশগুল হয়ে পড়লেন আল্লাহর ইবাদাতে। আর এভাবেই কেটে গেল সারাটি রাত।

একদিন নয়। দুদিন নয়। এভাবেই কেটে যেত শাদ্দাদের রাতগুলো। ইবাদতের মাধ্যমে, নির্ঘুম অবস্থায়। আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে করে।

ইন্তেকাল করেছেন দয়ার নবীজী [সা]।

এসেছে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ।

এ সময়ে বেশ কিছুটা পরিবর্তন এসে গেছে মুসলমানদের মধ্যে।

তাদের এই পরিবর্তনে দারুণভাবে ব্যথিত হলেন শাদ্দাদ। ভয়ে এবং শংকায় কেঁপে উঠলো তার কোমল বুক। তিনি কাঁদছেন। কাঁদছেন আর অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে বেদনার বৃষ্টি।

শাদ্দাদ চলেছেন সামনের দিকে।

পথে দেখা পেলেন উবাদা ইবন নাসীকে। নাসীর হাতটি ধরে শাদ্দাদ তার বাড়িতে নিয়ে এলেন।

তারপর–

তারপর আবার কাঁদতে শুরু করলেন। ফুঁপিয়ে কাঁদছেন শাদ্দাদ।

তার কান্না দেখে উবাদা ইবন নাসীও কাঁদছেন। আপনি কাঁদছেন কেন? শাদ্দাদ জিজ্ঞেস করলেন। নাসী বললেন, আপনার কান্না দেখে আমারও কান্না পাচ্ছে। কিন্তু আপনিই বা কাঁদছেন কেন? শাদ্দাদ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কাঁদছি–কারণ, রাসূলের [সা] একটি হাদীস আমার মনে পড়ছে।

হাদীসটি কী? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

শাদ্দাদ বললেন, হাদীসটি হলো : রাসূল [সা] বলেছেন,

'আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হয় আমার উম্মতের প্রবৃত্তির গোপন কামনা-বাসনার পূজারী হওয়া এবং শিরকে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে।'

রাসূলের [সা] কথা শুনে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার উম্মত কি মুশরিক হয়ে যাবে?

www.pathagar.com

রাসূল বললেন, হ্যাঁ। তবে তারা চন্দ্রসূর্যকে পূজা করবে না। পূজা করবে না মূর্তি, পাথর বা অন্য কনো বস্তুরও। তারা পূজা করবে রিয়া এবং প্রবৃত্তির। সকল মানুষ রোযা রাখবে। কিন্তু যখন তার প্রবৃত্তি চাইবে, আর সাথে সাথে নি:সংকোচে তখন তা ভেঙ্গে ফেলবে।

কী নিদারুন পরিতাপের বিষয় বলুন! সেই জন্যই আমি কাঁদছি। বললেন শাদ্দাদ।

এমনি তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন শাদ্দাদ। আল্লাহর প্রতি ছিল তার এমনি ভয়, ঈমান আর মুসলমানদের প্রতি ছিল তার এমনি অপরিসীম ভালবাসা।

রাসূল [সা] বসে আছেন।

তাঁর চারপাশে ঘিরে আছে আলোর পরশ।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন শাদ্দাদ।

একি!

এ কেমন চেহারা শাদ্দাদের?

সারা চেহারায় বিষন্নতার কালো ছাপ!

চোখেমুখে মেঘের আস্তরণ!

চোখদুটো ভারাক্রান্ত!

বিমর্ষতায় ছেয়ে আছে শাদ্দাদ।

অবাক হলেন দয়ার নবীজী [সা]। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে তোমার ? শরীর খারাপ? না কি অন্য কিছু?

শাদ্দাদের কণ্ঠটি ধরে এলো।

বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মনে হচ্ছে– মনে হচ্ছে আমার জন্যে পৃথিবীটা সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! হাসলেন রাসুল [সা]

বললেন, না। তোমার জন্যে পৃথিবী সংকীর্ণ হবে না কখনো। নিশ্চিন্তে থাকতে পার তুমি। জেনে রেখ, একদিন বিজিত হবে শাম এবং বাইতুল মাকদাস। আর সেদিন, সেদিন তুমি এবং তোমার সন্তানরা হবে সেখানকার ইমাম।

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] ভবিষ্যত বাণী!

সত্যি তো হতেই হবে।

সত্যিই শাম এবং বাইতুল মাকদাস একদিন বিজিত হল। আর শাদ্দাদই হলেন সেখানকার নেতা।

তিনি সেখানে সপরিবারে বসতি স্থাপন করলেন। কেমন ছিলেন শাদ্দাদ?

কেমন ছিল তার তাকওয়া আর পরহেজগারী?

সে এক অনুকরণীয় ইতিহাসই বটে!

একবার একদল মুজাহিদ যাচ্ছেন জিহাদের ময়দানে।

তাদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন শাদ্দাদ।

যাবার সময় হলে মুজাহিদরা খাবার জন্যে আহবান জানালেন তাকে।

সবিনয়ে শাদ্দাদ বললেন,

রাসূলের [সা] হাতে বাইয়াতের পর থেকে খাবারটি কোথা থেকে এলো তা না জেনে খাবার অভ্যাস থাকলে অবশ্যই আজ তোমাদের সাথে খেতাম। কিছু মনে নিনো ভাই! তোমরা খাও।

এমনি ছিল শাদ্দাদের আল্লাহভীতি।

এমনি ছিল তার দীনদারী।

তিনি বলতেন, কল্যাণের সব কিছুই জান্নাতের। আর অকল্যাণের সবকিছুই জাহান্নামের। এই দুনিয়া একটি উপস্থিত ভোগের বস্তু। সৎ এবং অসৎ সবাই তো ভোগ করে। কিন্তু আখেরাত হচ্ছে সত্য অঙ্গীকার। যেখানে রাজত্ব করেন এক মহাপরাক্রমশালী রাজা। অর্থাৎ মহান রাব্বুল আলামীন। প্রত্যেকেরই আছে সন্তানাদি। তোমরা আখেরাতের সন্তান হও। দুনিয়ার সন্তান হয়োনা।

কী চমৎকার কথা!

www.pathagar.com

শাদ্দাদের মত সোনার মানষ, খাঁটি মানুষই কেবল বলতে পারেন এমন সোনার চেয়ে দমী কথা।

শাদ্দাদ ছিলেন যেমন খোদা ভীরু, তেমনি ছিলেন সাহসী।

তার সাহসের অনেক উপমা আছে।

আছে আগুনঝরা ইতিহাস।

হযরত মুয়াবিয়া তখন শাসনকর্তা। কী তার দাপট আর ক্ষমতা।!

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন শাদ্দাদকে। আচ্ছা, বলুন তো আমি ভালো, না কি হযরত আলী? আমাদের দুজনের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?

স্পষ্টভাষী শাদ্দাদ।

তিনি অকপটে বললেন, আলী আপনার আগে হিজরত করেছেন। তিনি রাসূলের [সা] সাথে অনেক বেশি ভালো কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন আপনার চেয়ে বেশি সাহসী। আর তিনি ছিলেন আপনার চেয়ে অনেক বেশি উদার ও প্রশস্ত একটি হৃদয়। আর ভালবাসার কথা বলছেন? আলী চলে গেছেন তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। সুতরাং মানুষ আজ আপনার কাছে তো বেশি কিছু অবশ্যই আশা করে।

এই ছিল শাদ্দাদের সততা। এই ছিল তার সত্যবাদিতা এবং অমলিন জীবন।

ছিল সাগরের মত বিশাল আর আকাশের মত প্রশস্ত একটি হৃদয়।

ছিলেন অসীম সাহসী আর ঈমানের ওপর পর্বতের মত অবিচল।

কেন হবেন না?

তিনি তো ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মহান নেতা–প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদেরই [সা] একান্ত স্নেহ আর ভালবাসায় সিক্ত। যেন ভালবাসায় ভেজা ভোর।

তিনি তো ছিলেন সত্যের সৈনিক, বেহেশতের আবাবিল।

nnnnnnn

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি মোশাররফ হোসেন খান। ১৯৫৭ সালের ২৪শে আগষ্ট তিনি একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান- যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত বাঁকড়া গ্রামে। পিতা- ডা. এম. এ. ওয়াজেদ খান এবং মাতা- বেগম কুলসুম ওয়াজেদ।

তিনি মাসিক ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য পত্রিকা 'নতুন কলমের' সম্পাদক এবং বহুল প্রচারিত 'মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক।
তিনি বাংলা সাহিত্যকে আমাদের বিশ্বাস, আদর্শ, ঐতিহ্য এবং মৌল চেতনার সাথে আধুনিকতাকে সম্পৃক্ত করে আধুনিক সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই অসামান্য বরেণ্য কবি শিশুসাহিত্যেও বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছেন।

আশা করি বইটি সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য সমান আনন্দদায়ক ও গ্রহণযোগ্য হবে।

—প্রকাশক

সমাহার

সমাহার পাবলিকেশন্স
ISBN 984-70005-0026-7